একটি আত্মার মৃত্যু

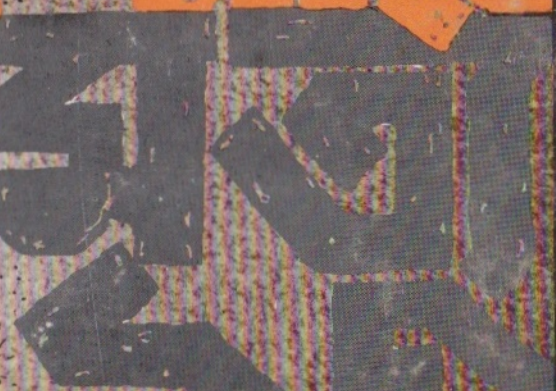

একটি আত্মার মৃত্যু

আবদুল মোহাইমেন

একটি আত্মার মৃত্যু

মোঃ আবদুল মোহাইমেন

www.pathagar.com

একটি আত্মার মৃত্যু

প্রথম প্রকাশ ঃ
কার্তিক, ১৩৯২
নভেম্বর, ১৯৮৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
মাঘ, ১৩৯৪
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ইং

লেখক ও প্রকাশক ঃ
এম, এ, মোহাইমেন
২নং ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী
কে. জি. মুস্তাফা

মূল্য : ত্রিশ টাকা (সাদা কাগজ)
বিশ টাক (বুক প্রিন্ট)

মুদ্রণে ঃ
দি ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস
৩/৫ জনসন রোড, ঢাকা-১

পরিবেশক :
পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স
২, ডি, আইটি এভিনিউ
ঢাকা
ফোন : ২৩১৫৯১/২৩৩৯২৯ ।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

"একটি আত্মার মৃত্যু" লেখাটি ৭/৮ মাস আগে ছোট গল্পের আকারে লিখা আরম্ভ করেছিলাম, ব্যবসা জীবনে এসে ঘাত প্রতিঘাতে নিজের মন মানসিকতা বর্তমানে কত পরিবর্তিত হয়েছে সেটাই ভাবলাম লেখার মারফত প্রকাশ করে বন্ধুবান্ধবদের জানাই। প্রথমে এর মেন স্ক্রিপ্ট্ ছিল মাত্র ৩০/৩২ পৃষ্ঠা। বন্ধুবান্ধব ২/১ জনকে পড়তে দেওয়ার পর তাদের খুব ভাল লাগল এবং এটাকে তারা আরও বাড়াতে অনুরোধ করল। তাদের অনুরোধে আরও ২০/২৫ পৃষ্ঠা বাড়িয়ে যখন আবার কয়েকজনকে পড়তে দিলাম, দেখলাম একই ব্যাপার। তারাও বলতে লাগল, এটুকু পড়ে তৃপ্তি হচ্ছেনা, আপনার "আত্মার মৃত্যু" সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আরও বিষদভাবে জানতে চাই। একটু একটু বাড়াতে বাড়াতে এটি বর্তমান আকারে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখানে আমি তাদের সম্বন্ধে লিখেছি যারা নানাভাবে আমার জীবন পথে এসেছেন। যাদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, অপরের হয়তো রয়েছে তাদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা থেকে পারতপক্ষে যতদূর সম্ভব আমি বিরত র'য়েছি। যাদের আমি ভাল দেখেছি এবং প্রশংসা ক'রেছি তারা ছাড়াও বহু ভাল লোক র'য়েছেন যাদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় উল্লেখ করিনি। অসাধু যে সব ব্যক্তিদের নাম আমি এখানে উল্লেখ করেছি বোধগম্য কারনেই তা অধিকাংশই কাল্পনিক। যদি ঘটনাক্রমে কারও নামের সঙ্গে মিলে যায় ভাববেন এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে।

বন্ধুবান্ধব মহল থেকে পৌরকর, বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কে লেখার জন্য বহু অনুরোধ এসেছিল। সাহিত্য এবং লেখা আমার পেশা নয়। আর মানুষটি আমি নিজে খুব আল্‌সে ধরণের। জন্মগত কবি বা সাহিত্যিক

www.pathagar.com

দের মত কলম ধরলেই আমার লেখা আসেনা। সপ্তাহ, দশদিন অনেক সময় মাসাধিক কাল চেষ্টা করে মনকে বশে আনতে হয়, কিন্তু একবার বশে আনতে পারলে তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা লিখে যেতে আর কোন অসুবিধা হয় না।

তাই বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎ, পৌরকর, টেলিফোন এবং আরও আরও অনেক সমস্যা যেগুলি বাস্তবিকই সমাজ জীবনকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খেয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সে মৃত্যুর আমিও একজন অসহায় শিকার, সেগুলি সম্বন্ধে লিখতে গেলে বইটির প্রকাশনা আরও বহু বিলম্বিত হয়ে যাবে, এই ভয়ে সেগুলি সম্বন্ধে এ বইতে আলোচনা করতে গেলাম না। বিষয়গুলি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি যে এর উত্তাপে কিভাবে ঝলসে গিয়ে প্রতিনিয়ত করুণভাবে কাবার হয়ে যাচ্ছি যদি সম্ভব হয় পরবর্তী সংস্করণে বিষদভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

এখানে শুধু এটুকু বলব যে বিদ্যুৎ এবং পৌরকর গত দশ বৎসরে যেভাবে বাড়ান হয়েছে এটা শুধু অযৌক্তিক নয়, অমানবিকও বটে। বাংলাদেশে গত দশ বৎসরে বিদ্যুতের মূল্য বাড়ান হয়েছে প্রায় দশগুণ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল উৎস হচ্ছে গ্যাস এবং পানি যা বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় না, বা কারও কাছ থেকে কিনতেও হয় না। এ অবস্থায় এর মূল্য যে কোন বছর বছর অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা হচ্ছে তা কারও বুদ্ধিতে আসছে না। কর্তৃপক্ষকে নানা ফোরামের ভিতর দিয়ে বলেছি আমাদের পার্শ্ববর্তী তিনটি রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় গত কয় বৎসরে বিদ্যুতের দাম কত বেড়েছে তা জেনে নিতে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস যেমন গ্যাস ও পানি তাদের দেশেও তাই, তবে তাদের দেশে দর যদি গত দশ বৎসরে দ্বিগুণ তিনগুণের বেশী না বেড়ে থাকে, তবে আমাদের দেশে দশ গুণ বাড়বে কেন? সিস্টেম লস্ সে সব দেশে কত আর আমাদের এখানে কত? যতবারই উক্ত বিভাগের বড় কর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি তারা বলে ভারত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিজেরা তৈরী করে তাই সস্তায় বিদ্যুৎ দিতে পারে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করি, যন্ত্রপাতি ত ক্যাপিটাল একস্পেন্ডিচার, একবার কিনলেই দশ বার বৎসর আর বদলাবার প্রয়োজন হয় না, তাই বৎসরে ২/৩ বার করে বিদ্যুতের দাম বাড়াবার সঙ্গেএর

www.pathagar.com

কি সম্বন্ধ রয়েছে, তখন কর্তৃপক্ষ আর কোন জবাব খুঁজে পান না। প্রকৃত-পক্ষে সিস্টেম লস-এর নামে বিদ্যুৎ বিভাগের কিছু লোকেরা উৎপাদিত বিদ্যুতের একটা বিরাট অংশ চুরি ক'রে বৈধ অবৈধ গ্রাহকদের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে এবং তা ঠেকাতে না পেরে কর্তৃপক্ষ অনবরত দাম বাড়িয়ে চলেছে।

আজ অধিকাংশ ব্যক্তিগত শিল্পকারখানার মালিক ও বাড়ী ঘরে বিদুৎ ব্যবহারকারীরা বিদ্যুৎ বিভাগের লোকের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসতে বাধ্য হচ্ছে দশ বার বৎসর পূর্বে যেটা কেউ কল্পনাই করতে পারত না। সরকারের ভুল ও অবাস্তব ব্যবস্থার ফলে আজ সমস্ত দেশের মানুষকে চোর বানিয়ে দেশকে শেষ করে ফেলা হচ্ছে।

পৌরকর সম্বন্ধেও একই কথা। গত দশ বৎসরে পৌরকর যে হারে বেড়েছে তা অবর্ণনীয়। এই বিভাগেও করের পরিমাণ প্রায় চৌদ্দ পনর গুণ বেড়েছে। এ বিভাগে কর্মচারীদের মাইনা না হয় তিন চার গুণ বেড়েছে কিন্তু পৌরকর চৌদ্দ পনর গুণ বাড়ার কোনও যুক্তসঙ্গত কারণই খুজে পাওয়া যায় না। ঢাকা শহরের আয়তন বহুগুণ বেড়েছে এবং বাড়ী ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বেড়েছে বহুগুণ। তাই এই পৌরকর ও ওয়াসাকর বৃদ্ধির যৌক্তিকতাই খুজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে ঢাকার বাড়ীর মালিকদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হচ্ছে পৌরকরের ব্যাপারে। কাজকর্ম ফেলে মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন সমস্ত শহর খুজে বেড়ায় কোন্ পাড়ায় কোন্ খানে নূতন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। নির্মিয়মাণ বাড়ী দেখতে পেলেই মিউনিসি-প্যালিটির লোক মালিকের কাছে এসে প্ল্যান দেখতে চাইবে কবে তৈরী আরম্ভ হয়েছে জানতে চাইবে এবং যেদিন থেকে বাড়ী তৈরী আরম্ভ করেছেন সেদিন থেকেই পৌরকর দাবী করে বসবে। তখন বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে আপনাকে একটা বন্দোবস্তে আসতে হবে নচেৎ অচিরেই মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বিরাট অংকের কর দাবী করে এক পত্র আপনার হাতে এসে পৌছুবে।

গত কয়েক বৎসর ধরে আর এক মারাত্মক ব্যাপার দেখা যাচ্ছে সেটা যেমনই অসহণীয় তেমনই ভয়াবহ। যে বাড়ীর বৎসরিক পৌরকর পাঁচশত টাকার বেশী হতে পারেনা তারই প্রভিশনাল এসেসমেন্ট করে দেওয়া হল পাঁচ হাজার টাকা। আপনি নোটিশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কিন্তু যে

www.pathagar.com

লোক নোটিশ নিয়ে এল সে বলল আপনি আপিল করুন এর আপিলের আগে এসেসমেন্ট বিভাগের কারও সঙ্গে দেখা করুন। দেখা করলে কিভাবে এসেসমেন্ট কমান যায় তিনি বলে দেবেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এসেস-মেন্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের এটাই হলো এক ধরণের মারাত্মক ষড়যন্ত্র। পৌরকর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পর যে বাড়ীর পৌরকর হওয়া উচিৎ বৎসরে হাজার টাকা সেটাই চৌদ্দ পনর হাজার টাকা স্থির করে নোটিশ দিয়ে দেবে। তার পরই এসেসমেন্ট বিভাগের লোকেরা দিশেহারা বাড়ীর মালিক থেকে ৭/৮ হাজার টাকা নিয়ে কিভাবে দরখাস্ত দিতে হবে বলে দেবে এবং অনেক সময় নিজেরাই দরখাস্ত ড্রাফট করে দেয়। তারপর দেখবেন আপনি আপত্তি দেওয়ার পর প্রিলিমিনারী আপিল কমিটিতে ১৫ হাজারের পরিবর্তে আপনার এসেসমেন্ট দশ হাজার হয়েছে, অর্থাৎ শতকরা তিরিশ ভাগ কমেছে। অবশ্য এটাও খুব বেশী বলে আপনি মিউনিসিপ্যালিটির লোকের পরামর্শ অনুযায়ী আবার আপীল করলেন এবং দেখলেন এবার আরও তিন হাজার কমে সাত হাজারে এসেছে সেটাও সত্যিকারভাবে অত্যন্ত বেশী।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে গত দশ বার বৎসরে পৌরকর দ্বিগুণ তিনগুণের বেশী বেড়েছে কিনা সন্দেহ, কারণ এতে ফরিন একচেঞ্জের ব্যাপার খুব জড়িত নয় যে আমদানী খরচ খুব বেড়ে গেছে বলে অজুহাত দেওয়া চলবে। আসল ব্যাপার হলো আমাদের এখানে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মধ্যে রাস্তা ঘাট তৈরি ও মেরামতের কন্ট্রাক দেওয়ার ব্যাপারে, ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে বিরাট বিরাট পুকুর চুরি হচ্ছে যেটা ক্রমাগত অযৌক্তিকভাবে পৌর ও ওয়াসাকর বাড়িয়ে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলছে। এর ফলে ক্রমাগত বাড়ী ভাড়া বেড়ে গিয়ে বাঁধা মাইনের মধ্যবিত্ত লোকগুলিকে পিষে মেরে ফেলার বন্দোবস্ত করা হচ্চে।

আমার এ লেখার পিছনে যে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আমাকে ক্রমাগত প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন তার মত দুচার জনের নাম আমি উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। এরা হলেন প্রফেসর আসহাব উদ্দিন আহম্মদ, এডভোকেট গাজীউল হক, আবুজাফর শামসুদ্দীন, শিল্পি কামরুল হাসান, মিসেস তাজকেরা খায়ের প্রভৃতি। তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। প্রফেসর আসহাব উদ্দীন প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমাকে পত্র দিয়ে বই কবে বের হবে জানতে চাইতেন

www.pathagar.com

এবং তিনি ও তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা অধীর আগ্রহে এর প্রকাশনার জন্য অপেক্ষা করছেন বলে জানাতেন। তাঁর উৎসাহ আমাকে বিশেষ ভাবে অনু-প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই তার কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। আমার এ বইতে অধিকাংশ পাঠক যদি নিজেদের খুঁজে পান তবে আমার লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মোঃ আবদুল মোহাইমেন
ঢাকা ৯-১১-৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

একটি আত্মার মৃত্যুর প্রথম সংস্করণ দেড় বৎসরের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রথম সংস্করণ পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করার পর অনেক পাঠক তাদের জীবনের দুঃখ নিগ্রহের ঘটনা দিতীয় সংস্করনে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানায়। তাই কিছু কিছু নূতন সংযোজন করা হয়েছে।

বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে এই বইটির বহুল প্রচারার্থে এর একটি সুলভ সংস্করণ বের করার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের ধারণা বইটি বংলাদেশের ঘরে ঘরে পড়া উচিত, এজন্য এটিকে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনার জন্য শুধুমাত্র প্রস্তুত মূল্যে এটি বাজারজাত করতে হবে। বন্ধুদের অনুরোধে এবং বইটির সামাজিক মূল্য বিবেচনা করে অতি অল্পদামে বুক প্রিন্টিং কাগজ এর একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করতে মনস্থ করেছি। বইটির ছাপা ও বাঁধাই খরচ উঠে এলেই আমি খুসি হব। নিজে প্রুফ দেখতে না পারায় কিছু বানান ভুল হয়ত রয়ে গেছে, তজন্য আমি পাঠকদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থি।

এম. এ. মোহাইমেন
১০/২/৮৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একটি আত্মার মৃত্যু

১৯৭২ সনের শেষ ভাগ। একদিন সপ্তাহের হিসাব পরীক্ষা করছি। হঠাৎ একটি অঙ্কের দিকে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হলাম। বাজে খরচ একুশ হাজার টাকা। অনেকক্ষণ অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একুশ হাজার টাকার মত বিরাট অঙ্কের বাজে খরচ কি হতে পারে বুদ্ধিতে এলোনা। ম্যানেজার রশিদ সাহেবকে ডাকলাম। এই রশিদ সাহেব ১৯৫০ সনে আমাদের প্রেসে একশত টাকা বেতনে যোগ দিয়ে বর্তমানে তিন হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন। এই সুদীর্ঘ কাল একই প্রেসে একটানা কাজ করে যাওয়ার উদাহরণ বিরল। একমাত্র ইডেন প্রেসের রাজা মিয়া ও স্টার প্রেসের মতি মিয়া ছাড়া এরূপ দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। সততা ও নিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর আচরণ সন্দেহাতীত। তাই উল্লেখিত অঙ্কটা খরচ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কি বাবদ এত টাকা খরচ হয়েছে তা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

রশিদ সাহেব প্রশ্ন শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। পরে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন স্যার ওটা কমিশন। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কমিশন? কাকে দিয়েছেন? কৈ এত বৎসর ধরে ব্যবসা করছি এত টাকা তো কখনো কাউকে কমিশন বা ঘুষ দিতে হয়নি। তখন রশিদ সাহেব বললেন স্যার দিনকাল এখন পালটে গেছে। আগের দিন আর নেই। এখন কমিশন বলুন আর ঘুষই বলুন টাকা না দিলে দু'একটি অফিস ছাড়া বাকি আর কোন অফিস থেকেই কাজ আসেনা। আগে ভাল ছাপার কদর ছিল আমাদেরও বাজারে সুনাম ছিল এমনিতেই যথেষ্ট কাজ আসতো, বরং আমরা কাজটা গ্রহণ করলেই বহু পার্টি বর্তে যেত। কিন্তু এখন দিন অন্য রকম হয়ে গেছে। সরকারি কি বেসরকারি প্রায় সব অফিসেই কমিশনের রেওয়াজ হয়ে গেছে। এটা না দিলে কাজ দেয় না। জিজ্ঞাসা করলাম সব অফিসের অফিসারেরাই কি এই কমিশনটা নেন না শুধু কেরানীরাই নেয়। রশিদ সাহেব বললেন আগে শুধু ডিলিং এসিস্ট্যান্ট, স্টোরকিপার প্রভৃতিরাই নিত। কালে ভদ্রে অফিসারদের দু'একজনকেও ভাগ নিতে দেখেছি। কিন্তু স্বাধীনতার পর এখন প্রায় সব অফিসেই পার্চেজ সেকশনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রায়

www.pathagar.com

সবাই কমিশনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে শুনেছি। আর না পড়েই বা কি করবে স্যার যত বড় অফিসারই হউক বর্তমানে জিনিষ পত্রের দাম যা দাঁড়িয়েছে তাতে মাসের মাইনেতে তাদের দশ দিনও চলে না। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। রাগ করে বললাম কাজও ভাল করতে হবে কমিশনও দিতে হবে এ কেমন কথা? ঘুষ, কমিশন দেওয়ার দরকার নেই, ব্যবসা না হয় খানিকটা কম হবে তাতে আমাদের কোন রকমে চলে যাবে, ওসবের মধ্যে যাবেন না। ম্যানেজার সাহেব স্তব্ধ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন স্যার এমনিতেই কমিশন দিতে রাজি না হওয়ায় গত কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের বেশ কয়েকটি বড় বড় বাঁধা পার্টি ছুটে গেছে। কিন্তু আপনার নির্দেশ মত চলতে গেলে বাকি যে পার্টিগুলো আছে সেগুলোও অল্পদিনে হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বললাম যায় যাবে, কি আর করা যাবে, তার জন্য বিবেকের গলায়তো আর ছুরি দিতে পারি না। রশিদ সাহেব বললেন স্যার এতে প্রেস নির্ঘাত বন্ধ হয়ে যাবে, তাতে আপনাদের হয়তো তেমন ক্ষতি হবেনা—আপনারা যা বাড়ী ভাড়া পান তাতে আপনাদের বেশ চলে যাবে কিন্তু আমরা যে দু'শ কর্মচারী আপনার এখানে কাজ করছি তাদের কি হবে, আমরা কোথায় যাব এ দুর্মূল্যের বাজারে?

শুনে আমি নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম। সত্যি তো আমরা মালিক পক্ষের দু'চার জন প্রেস বন্ধ হয়ে গেলেও যা বাড়ী ভাড়া পাই তাতে আমাদের চলে যাবে। কিন্তু এতগুলো শ্রমিক কর্মচারী কোথায় যাবে? এ দুর্মূল্যের বাজারে কোথায় গিয়ে চাকুরী পাবে? হাতের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। শেষ পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাছে নতি স্বীকার না করে উপায় নাই বুঝতে পারলাম। মনে জিজ্ঞাসা এলো এই জন্যই কি দেশ স্বাধীন করলাম? কত কল্পনা ছিল দেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তান আমলে দেশে যেসব অন্যায় অবিচার অনাচার দেখেছি তার অবসান ঘটবে এবং আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাস করবার মত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তা না হয়ে একি হলো? পাকিস্তান আমলে ঘুষ যে ছিলনা তা নয় তবে এত খোলাখুলি এত ব্যাপক আকারে ছিলনা। তখনও ঘুষ ও কমিশনের প্রচলন যে না ছিল এমন নয় তবে তার ধরণটা ছিল অন্য রকম। দেওয়া নেওয়ার মধ্যে ছিল ভদ্রতার একটা সূক্ষ্ম সহণীয় আবরণ যেটা ঘুষ দিচ্ছি জেনেও বিবেকে বেশী লাগতনা, এত অপমান বোধ করতাম না। সেটা ছিল এধরনের, যেমন কবিরাজ গলির প্রেসের অফিসে বসে আছি, এক ভদ্রলোক হঠাৎ

www.pathagar.com

এসে বললেন মোহাইমেন সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ে শাড়ী কিনতে এসেছিলাম এখন দেখছি একশত টাকা কম পড়ে গেছে, আপনি যদি একটু কষ্ট করে টাকাটা দেন কালই আমি পিয়ন দিয়ে পাঠিয়ে দিব। যে সময়ের কথা বলছি তখন পাটুয়াটুলি, ইসলামপুরই ছিল ঢাকার অভিজাত শ্রেণীর বাজার করার একমাত্র জায়গা। নিউ মার্কেট ও বায়তুল মোকাররমের তখন জন্ম হয়নি।

যে ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ জানালেন তিনি একটি অফিসের বড়কর্তা। আমি জানতাম ধার হিসাবে তিনি যে টাকা চাইছেন তা শোধ করবার কথা কোনদিনই তার মনে হবে না। বরং শোধ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে গেলে সে অফিসের কাজ আমাদের নির্ঘাত হারাতে হবে। তাই সব জেনেও হাসি মুখে তার হাতে একশত টাকার নোটটি তুলে দিয়ে বললাম তাড়াহুড়া নেই যখন খুশী পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কখনও হয়ত কোন অফিসের মেজো কর্তা এসে বলতেন ভাই শালীর বিয়েতে উপহার কিনতে এসে পঞ্চাশ টাকা কম পড়ে গেছে। আপনি এই টাকাটা দিলে এই মুহূর্তে ভারি উপকার হয়, কাল পরশুই ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আমিও অম্লান বদনে টাকাটা তার হাতে তুলে দিয়ে, প্রয়োজনের সময় আমাকে আপন মনে করে চাইতে যে দ্বিধা সংকোচ করেননি এতে কৃতার্থ হয়ে গেছি এমনি একটা ভাব দেখালাম। কস্মিনকালেও যে টাকাটা ফিরে আসবে না এ সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত, বরং ফেরতের জন্য তাগাদা দিলে আমাদের কাজের মধ্যে কোন না কোন ভাবে খুঁত বের করে দুদিনে বড় সাহেবের মন খারাপ করে দিয়ে আমাদের কাজ পাওয়া বন্ধ করে দেবে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনকার পঞ্চাশ বা একশত টাকা আজকের পাঁচশ বা হাজার টাকার সমান।

আরেক রকমের ঘুষ নেওয়ার পদ্ধতি তখন ছিল যা আর একটু স্থূল প্রকৃতির। হঠাৎ ইণ্ডাস্ট্রি বা বড় কোন প্রাইভেট ফার্মের কোন বড় অফিসার যার হাত দিয়ে আমাদের লাইসেন্স বা প্রচুর কাজ আসতো, হঠাৎ একদিন এসে বললেন মোহাইমেন সাহেব বাড়ী করতে গিয়ে দারুণ বিপদে পড়ে গেছি। ইঞ্জিনিয়ার যে এস্টিমেট দিয়েছিল এখন দেখছি তার চাহিতে অনেক বেশী টাকা লাগবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ছাদ ঢালাই হয়ে যাবে, এখন হাজার পাঁচেক টাকার জন্য খুব ঠেকে গেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই হাউস্ বিল্ডিং থেকে একটা কিস্তির টাকা পাবো—পেলেই আপনার টাকাটা দিয়ে দিব। এখন আমাকে একটু সাহায্য করতেই হবে।

www.pathagar.com

কখনও বা এক অফিসার এসে বলতেন ভাই হঠাৎ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি। আমার একটা লাইফ পলিসি এ মাসেই ম্যাচিয়োর করবে—টাকাটা পেলেই আপনাকে দিয়ে দেব। এখন সম্প্রতি আমাকে হাজার তিনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রেই টাকা যে ফেরত পাওয়া যাবে না এটা আমি নিশ্চিত জেনেও বন্ধু হিসাবে তাদের বিপদে সাহায্য করছি এমন একটা ভাব দেখিয়ে টাকা দিয়ে দিতাম।

এভাবে যাদের টাকা দিয়েছি তাদের কাছ থেকে টাকা যে একেবারেই ফেরৎ পাইনি তা নয়। শতে দু'একজন অনেক বৎসর পর টাকাটা নিয়ে এসে ফেরৎ দিতে চাইলে একটু অবাক হয়েছি। বুঝেছি ভদ্রলোক সত্যিই অভাবে পড়ে ধার নিয়েছিলেন, অসুবিধার দরুন এতদিন ফেরৎ দিতে পারেন নি। তখন মানুষটিকে সত্যিই শ্রদ্ধা না করে পারিনি। এরকম একজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি। ইনি হলেন ঢাকার আমদানী রফতানি অফিসের তদানিন্তন এক্সিকিউটিভ অফিসার চট্টগ্রামের শেহাব উল্লাহ সাহেব। ভদ্রলোক বাড়ি করার জন্য বহু বৎসর আগে একদিন পাঁচ হাজার টাকা মাস কয়েকের জন্য নিয়ে গেলেন। অনেকদিন তিনি না আসায় টাকাটার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু বছর কয়েক আগে তিনি হঠাৎ একদিন এসে টাকাটা যখন দিয়ে গেলেন তখন রীতিমত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝলাম সত্যিকার প্রয়োজনেই টাকাটা তিনি নিয়ে ছিলেন। ইনি তখন চট্টগ্রাম অফিস থেকে ডিপুটি কন্ট্রোলার হিসাবে রিটায়ার করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমার ব্যবসা জীবনে এরূপ ঘটনা বহু ঘটেছে, কিন্তু মনে তখন কোন গ্লানি বোধ করিনি কারণ এ ঘটনা অহঃরহঃ ঘটতো না, ঘটতো কালে ভদ্র। এসব অফিসাররা ধার নিতেন দু'চার বছরে হয়তো একবার, আর সে নেওয়ার মধ্যেও একটা শালীনতা ছিল। ঠিক কমিশন বা ঘুষের মত দেখাতো না।

কিন্তু বর্তমানে ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরা অশালীন এবং অফিসারদের যেন একটা ন্যায্য পাওনার পর্যায়ে এসে গেছে এবং গত ১৬ বৎসরে এ দুর্নীতি শশীকলার মতো বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন একটা সর্বনাশা পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে, যা যে কোন বিবেকবান মানুষের কাছেই অত্যন্ত অবমাননাকর মনে হয়। ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিক থেকেই এর আরম্ভ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন অফিসে ব্যবসার খাতিরে আত্মবিক্রি

www.pathagar.com

করে, তিল তিল করে নিজেকে কিভাবে হত্যা করে চলেছি ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ৩০/৪০ বৎসর পূর্বে যখন প্রথম ব্যবসা জগতে আসি সেদিনের কথা এখন চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যাই, ধীরে ধীরে নিজের অজান্তে কি করুণ ভাবে আপনাকে মৃত্যুর দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিয়েছি। এটা এক দিনে ঘটে নি। স্বীয় জাগতিক শ্রীবৃদ্ধির নেশায়, আরও অধিক সম্পদ করায়ত্ব করার লোভে ধীরে ধীরে অন্যায়ের সংগে আপোষ করেছি, একটু একটু করে পায়ের তলার জমি ছেড়ে দিয়ে মানসিক শক্তি হারিয়ে ক্লীবে পরিণত হয়েছি। আজকের আমার এ অধঃপতনের কথা চিন্তা করলে সত্যি অবাক লাগে ৪০ বছর আগে কি ছিলাম আর এখন কি হয়েছি?

অতীত জীবনের কথা আজ মনে পড়ে যখন সামান্য অন্যায়, অসাধুতার সঙ্গে আপোষ করার প্রশ্ন উঠলে সতেজ মন ভীষণভাবে রুখে দাঁড়াত। ঘুষ দেওয়া নেওয়াটাকে সাংঘাতিকভাবে ঘৃণা করতাম। আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি প্রখর। কোন অবস্থাতেই কারও কাছে মাথা নত করবনা এই ছিল প্রতিজ্ঞা। অবশ্য এর জন্য অনেকবারই অর্থ এবং লাভের দিক থেকে আমাকে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। এ সম্পর্কে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। পাকিস্তান আমলে ইস্টার্ন ফ্রেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী ছিল ঐ ধরনের কোম্পানীগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। ১৯৪৭ সন থেকে এর হেড অফিস চট্টগ্রামে এবং ঢাকায় পাটুয়াটুলিতে একটি ব্রাঞ্চ অফিস ছিল। এখানে তখন সামান্য কিছু প্রিন্টিং-এর কাজ হতো। মিঃ আকরম শাহ্ বলে বাঙ্গালোরের এক ভদ্রলোক এখানে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন। লোকটি ছিলেন অতি ভদ্র ও সজ্জন। কাজের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠে। ১৯৫০ কি ৫১ সনে ঠিক মনে নেই শাহ্ সাহেবের জায়গায় মিঃ এস এম হক বলে বাঙ্গালী এক ভদ্রলোক বদলি হয়ে এলেন। কি কুক্ষণে জানিনা একদিন আমাদের একটি লেটার হেডের ২১ টাকার বিল তার হাতে পড়ল। লেটার হেডটি ছিল ১৮ পাউণ্ড বণ্ড পেপারে ছাপা। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাতে কি করে ১৬ পাউণ্ডের একটি সিট এসে গিয়েছিল। পাতলা কাগজটি হক সাহেবের পছন্দ হলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে যখন জানতে পারলেন ঐ কাগজ হলে বিল আরও দু'টাকা কম হতো সঙ্গে সঙ্গে তিনি ২১ টাকার বিল কেটে ১৯ টাকা করে দিলেন। আমি তাকে বললাম, যে নমুনার কাগজে আপনি রেট চেয়েছিলেন সে মতে আমি ২১ টাকা রেট দিয়েছি, পাতলা কাগজে চাইলে আমি ১৯

www.pathagar.com

টাকাই দিতাম। এখন আপনি আমার বিল কেন কাটছেন? তিনি উত্তর দিলেন 'আমার ইচ্ছা, কাউকে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই'। শুনে মুহূর্তে আমার রক্ত মাথায় উঠে গেল। অত্যন্ত অপমান বোধ করলাম। তাঁকে স্পষ্ট জানালাম বিল পেমেন্ট করতে তাকে ২১ টাকাই দিতে হবে। ওর কম হলে আমি পেমেন্ট নেবনা।

রাগ করে তার কামরা থেকে বেরিয়ে এলে অফিসের দ্বিতীয় অফিসার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ অলি আহাদের বড় ভাই আজিজুর রহমান সাহেব আমাকে হাত ধরে টেনে তার কামরায় নিয়ে গিয়ে বললেন মোহাইমেন ভাই, দু'টাকার জন্য আপনি এত কঠিন মনোভাব দেখাচ্ছেন কেন? দু'টাকা তো আপনার একদিনের সিগারেট খরচও নয়। হক সাহেবের কথা মেনে যান। আমি বললাম আজিজুর রহমান সাহেব ব্যাপারটা দু'টাকার নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে প্রেস্টিজের। হক সাহেব যে ভাবে কথা বললেন তাতে মনে হল তিনি একজন কন্ট্রাক্টর বা ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমিত ঠিকাদার নই, তিনি অন্যায় কথা বললে আমি মানব কেন। আজিজুর রহমান বললেন কিন্তু শাহ্ সাহেবত মাঝে মাঝে আপনার বিল থেকে চার পাঁচশ টাকাও কেটে দিতেন। আমি বললাম হাঁ কেটে দিতেন কিন্তু তাঁর এ্যাপ্রোচ ছিল অন্য রকম। দু চার পাঁচশত টাকা কেটে দিলে আমি যখন রেগে উঠে পেমেন্ট নেবনা বলে উঠে দাঁড়াতাম তখন শাহ্ সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন 'মোহাইমেন ছাব আপ কিঁউ এতনা গোস্‌সা হোতে হ্যাঁয়? কেতনা হাজার রূপেয়া আপ হামারা অফিসছে লেতে হ্যাঁয়? ঠিক হ্যায় ইস্ দাফা আপ মান যাইয়ে, ওয়াদা কারতেহেঁ আয়েন্দামে আপকো পোসা দেঙ্গে। একথার পরে আমার রাগ পানি হয়ে যেত। আমি হেসে উঠে বিলের বাকী অঙ্কটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে আসতাম। শাহ্ সাহেবের কথা বলার ধরন ও এ্যাপ্রোচই ছিল অন্য রকম, তিনি বিলে অনেক টাকা কেটে দিলেও গায়ে লাগতনা। আমি আজিজুর রহমান সাহেবকে বললাম আজ হক সাহেব বিনা কারণে দু'টাকা কেটেছেন, আমি যদি মেনে নেই আর একদিন দু'শো টাকা কেটে দিলেও আমি কিছু বলতে পারবনা।

যাহোক বিল পেমেন্ট আমি আর নিলামনা। দু'চার বার সে অফিস থেকে তাগাদা এল ১৯ টাকা পেমেন্ট নেওয়ার জন্য। আমি রাজি না

www.pathagar.com

হওয়ায় তারা অন্য প্রিন্টারকে ডেকে কাজ দিতে আরম্ভ করল এবং অত বড় কোম্পানী চিরদিনের জন্য আমার হাত ছাড়া হয়ে গেল। অল্প কিছু দিন পরেই ইস্টার্ণ ফেডারেলের হেড অফিস যখন চাকায় চলে এলো তখন এই অফিস থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রিন্টিং এর কাজ দেওয়া হয়েছিল এবং আমার পরে যে ছোট একটি প্রেস এখানে ঢুকেছিল তারা শুধু এ কোম্পানীর কাজ করেই একটি কটন মিলের একজন প্রধান অংশিদার হতে পেরেছিল। পরে যখন এ কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করাচ্ছে শুনতে পেতাম তখন আফসোস হতো কেন রাগ করে দু'টাকার জন্য এত বড় কোম্পানী ছেড়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সুযোগ হারিয়েছি। কিন্তু যখনই আত্মসম্মানের কথা মনে হতো তখন ভাবতাম ঠিকই করেছি আত্মসম্মানের দাম টাকা দিয়ে হয় না। ইস্টার্ণ ফেডারেল সে বিল শেষ পর্যন্ত ২১ টাকাই পেমেন্ট করে, অনেকদিন পরে টাকাটা ডাক মারফত আমাদের হাতে আসে।

পরবর্তীকালে ভেবে দেখেছি এই অপরিমিত আত্মসম্মান বোধ যা অনেক সময় বেশ অযৌক্তিক পর্যায় গিয়ে অশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা, আমার ধারণা মতে, জন্ম নেয় উচ্চ শিক্ষা থেকে। আমার মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পক্ষে উচ্চ শিক্ষা একটা মস্ত বড় অন্তরায়। উচ্চ শিক্ষা মানে আমি নোট মুখস্থ করে কোন প্রকারে ইউ-নিভারসিটির ডিগ্রী লাভ বুঝাচ্ছি না। যে শিক্ষা মানুষের অন্তরকে বিকশিত করে, মানুষের মধ্যে অহং ও আত্মমর্যাদা বোধের জন্ম দেয় আমি তাকেই বুঝাচ্ছি। আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে ছোট থেকে বড় হতে গেলে মনটা সর্বংসহা হতে হয়। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়াও জন্মগত ভাবে যারা মনেপ্রাণে আত্মসম্মানের অধিকারী তাদের বেলায়ও এ ব্যাপারটা ঘটে।

যখন যেমন তখন তেমন অর্থাৎ প্রয়োজনে যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত ক্ষমতা মনের থাকতে হয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে আমার মনে হয় মনের এই ফ্লেকসিবিলি-টিটা কমে যায়। 'কেন?' নামের একটা অদ্ভুত টিসু মনের মধ্যে জন্ম নেয়। সব ব্যাপারেই মনে হয় অযথা কেন নিজেকে ছোট করব? আমি একজন এদেশের নাগরিক, যোগ্যতার খাতিরেই এটা আমার ন্যায্য পাওনা। অফিসার মাইনা পাচ্ছে তাকে 'কেন' আবার উপরি দেব? তাকে কেন অযথা খোশামোদ করতে যাব? এধরণের যৌক্তিক

www.pathagar.com

অযৌক্তিক অনেক প্রশ্ন মনে জেগে মনকে শক্ত করে ফেলে। কিন্তু অল্প শিক্ষায় মনের এ প্রসারতা ঘটেনা বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাজ হাসিলের জন্য প্রয়োজন বোধে যে কোন অবস্থায় যত দূর প্রয়োজন নিচে নেমে যেতে এদের অসুবিধা হয়না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ন্যায় অন্যায় বোধ, গৃহীত উপায় কোন কিছুই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

এব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। পাকিস্তান আমলে একদিন আমি শিল্প বিভাগের এক ডাইরেকটরের কামরায় ঢুকে গল্প করছিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বেশ জানা শুনা থাকায় ভিতরে অন্য একজন ভিজিটার থাকা সত্বেও ঢুকে পড়লাম। পূর্ব থেকে যে লোকটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল সে একজন অবাঙ্গালী, লোকটি কি একটা লাইসেন্সের জন্য অফিসারটিকে বারে বারে অতি বিনীতভাবে অনুরোধ করছিল। কিন্তু অফিসারটি বার বার বলছিলেন লাইসেন্স দেওয়া সম্ভব হবেনা, কোটা শেষ হয়ে গেছে। যখন কিছুতেই অফিসার রাজি হচ্ছিলনা তখন অবাঙ্গালী লোকটি হঠাৎ অফিসারের পা জড়িয়ে ধরে অনুনয় করতে লাগল। অফিসার ভদ্রলোক আর কি করেন, খুব বিব্রত হয়ে 'আচ্ছা এখন পা ছাড়ুন, যে ভাবে হউক করে দিব, যান এখন ভিজিটার রুমে গিয়ে বসুন' একথা বলে লোকটিকে বিদায় দিয়ে আমার দিকে হেসে বললেন দেখলেনতো কিরকম নাছোড় বান্দা, কয়দিন থেকেই হাঁটাহাঁটি করছিল, শেষ পর্য্যন্ত কাজটা বোধ হয় করে দিতেই হবে দেখছি। আমি ডাইরেকটার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে ভিজিটার রুমের ভিতর দিয়ে বের হওয়ার সময় অবাঙ্গালী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আচ্ছা জনাব আপনাকেতো আমি খানিকটা চিনি, আপনার অবস্থাতো খুব খারাপ নয়, বরং স্বচ্ছলই বলা চলে। আপনি একটি বিশ হাজার টাকার লাইসেন্সের জন্য অফিসারের পা জড়িয়ে ধরলেন, আপনার আত্মসম্মানে লাগল না?' লোকটি আমাকে অম্লান বদনে হেসে বলল 'জনাব এস্‌মে হারাজ (দোষ) কেয়া হায়। ইয়ে তো দস্তুর আনেকা মামলা। দাস্ আঁনেছে এক লাকস সাবুন খরিদকে হাত ধো লেঙ্গে, বাস সাফ হো যায়েগা। লেকেন লাইসেন্স মিলনেছে কমছে কম দস্ হাজার রূপেয়াত নাফা হোগা।' আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বুঝলাম ব্যবসা এরাই করতে পারবে। আমাদের মত লোকেরা পারবেনা।

www.pathagar.com

আর একবার ঘুষ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও ঘৃনিত কাজ বলে এক অবাঙ্গালী শিল্পপতিকে দোষারোপ করলে তিনি হেসে আমাকে বললেন 'মোহাইমেন ছাব আপ ইনকাম ট্যাক্স, মিউনিসিপাল ট্যাক্স, সেল ট্যাক্স দেতে হেঁ? আমি যখন বললাম দেই তখন বলল 'এসকোভি এক অফিসার ট্যাক্স সামাঝ লিজিয়ে।' অশিক্ষিত অবাঙ্গালীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। উচ্চ শিক্ষা যে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির পক্ষে একটা বিরাট অন্তরায় পশ্চিম বঙ্গে বাঙ্গালীদের অবস্থা দেখলেই বেশ টের পাওয়া যায়। সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য সবই প্রায় মারোয়াড়িদের হাতে। মারোয়াড়িদের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা খুবই বিরল, তাই ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য তাদের মানসিক গঠন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী-দের তুলনায় অনেক বেশী অনুকূল।

লেখাপড়া শিখে ব্যবসায় এসে আমার জীবনে আরও বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেশ বিভাগের পর যখন '৪৮ সনে প্রেসের ব্যবসা আরম্ভ করলাম তখন ছাপার কাগজের খুবই অভাব। একে কাগজের অভাব তাতে ঢাকায় তখনও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রাইভেট অফিস বা কলকারখানা গড়ে উঠেনি। সরকারী অফিস, রেলওয়ে, পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিসের ফরম ও বই প্রভৃতির কাগজ তদানীন্তন পূর্ব বঙ্গ সরকার কলকাতা থেকে সরকারী পর্য্যায়ে আনিয়ে ঢাকায় বিভিন্ন প্রেসে ছাপিয়ে নিতেন। তখনও তেজগাঁওতে সেন্ট্রাল ও বি জি প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঢাকায় প্রাইভেট প্রেস গুলির মধ্যেই বেঙ্গল প্রিন্টিং, ইডেন, ষ্টার, ইম্পেরিয়াল, ষ্টাণ্ডার্ড বলিয়াদি প্রভৃতি প্রেসগুলিতেই সাধারণতঃ সরকারের প্রিন্টিং এর কাজ হতো। আমরা অনেক চেষ্টা করে যদিও অনুমোদিত প্রেসের তালিকায় স্থান পেয়েছিলাম কিন্তু ভাল কাজ কোন দিনই পাই নাই। আমাদের দেওয়া হতো শুধু ফরম। এই ফরম ছাপার রেট ছিল খুবই কম। আসল লাভ ছিল বাইণ্ডিং, পারফোরেশন এবং নাম্বারিং কাজে। রেলওয়ে ও পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের লক্ষ লক্ষ বইয়ে পাশে সূতা দিয়ে ফোঁড় সেলাই, পারফোরেশন ও প্রতি পাতায় একটি কি দু'টি করে নম্বর থাকতো। তখন বাজার দর ছিল ফোঁড় সেলাই বই প্রতি এক আনা, পারফোরেশনের হাজার দর ছ' পয়সা, নাম্বারিং এর দর ছিল হাজার দু'আনা করে। অবশ্য লক্ষ লক্ষ হলে এই দাম আরোও শতকরা ত্রিশ ভাগ কমে যেত। কিন্তু সরকার বই বাঁধাইয়ের যে মূল্য তালিকা তৈরী করেছিলেন তাতে ফোঁড় সেলাইয়ের

www.pathagar.com

বই প্রতি দাম ছিল এক টাকা, হাজার পারফোরেশন ও নাম্বারিং এর দাম ছিল যথাক্রমে আট আনা ও এক টাকা। ফলে যারা বই নাম্বার ও পারফোরেশনের কাজ পেত তারা প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকা পেত তা কল্পনাতীত। রেলওয়ে, পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে এই বইগুলির অর্ডার সাধারণতঃ অফিস্যারদের পেটোয়া দুই তিনটি প্রেস পেত। বাকি আমরা ত্রিশ চল্লিশটি প্রেস যারা শুধু ফরম-ই ছাপতাম তারা বৎসরে যেখানে পেতাম দশ বার হাজার টাকা সেখানে তারা পেত গড়ে তিন থেকে চার লাখ টাকা। মুদ্রা মূল্য হিসাবে বিচার করলে আজকের দিনে সত্তর আশি লাখ টাকা। এর মধ্যে একটি প্রেসের মালিক ছিল অফিসারদের খুব বেশী ভালবাসার পাত্র। ইনি সব চাইতে মূল্যবান ও বেশী টাকার কাজ পেতেন। সব চাইতে বেশী টাকার চেক পেতেন। তিনি একটি ফতুয়া গায়ে দিয়ে পুরোনো শহরে পাটুয়াটুলির সামান্য দক্ষিণে তাঁর সদ্য নির্মীত লম্বা টিন সেডের প্রেসে বসতেন। লেখাপড়া বোধহয় প্রাইমারীর উপরে যায়নি। ইনি নিজে সব সময় বিড়ি খেতেন কিন্তু ৯৯৯ সিগারেটের একটি টিন সব সময় সঙ্গে রাখতেন—বাইরের কেউ গেলে এই সুগন্ধি সিগারেটের টিনটি এগিয়ে দিতেন।

এই লোকটি যে কত টাকা কন্ট্রোলার অফিস থেকে পেয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। তবে এইটুকু বলতে পারি তিনি যদি চাইতেন ঢাকা শহরে জমি জমার দাম তখন যা ছিল তাতে ইচ্ছা করলে তখনকার ঢাকা শহরের একটা বিরাট অংশ কিনে নিতে পারতেন। তবে প্রাপ্ত টাকার তিনি স্বয়ং কতটা পেয়েছেন আর অফিসারদের কতটুকু দিয়েছেন তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না। সে সময় লাখ দেড় লাখ টাকার চেক নিতে এমন দু'এক জনকে দেখেছি যারা অতি কষ্টে বেশীদের উপরে দস্তখত করতো, বোধ হয় দস্তখতটাই কোন রকমে শিখেছিল এর বেশী আর কিছু লিখতে পারতো না। আমরা গ্রেজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে ৩০/৪০ হাজার টাকার প্রেস করে ৬/৭ হাজার টাকার চেক পেতাম আর অফিসারদের কৃপাপুষ্ট ৩/৪ জন ৪০/৫০ হাজার টাকার প্রেসের মালিক হয়ে যখন ৩/৪ লাখ টাকার চেক হাতে তুলে নিত তখন রাগে দুঃখে বুকটা ছিড়ে যেতে চাইতো। কিন্তু করার কিছু ছিলনা।

তবে আল্লাহ্‌র মার বলে একটা কথা আছে। উপরে ফতুয়া গায়ে যে প্রেস মালিকটির উল্লেখ করেছি প্রিন্টিং কন্ট্রোলারের অফিস থেকে যিনি

www.pathagar.com

সবচাইতে বেশী টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয় এ অর্থের সামান্য অংশও তিনি নিজ জীবনে ভোগ করে যেতে পারেননি। কি অলৌকিক কারণে জানিনা কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ক্যান্সার রোগে এবং তাঁর ছোট দু'টি ভাই যারা তাঁর সঙ্গে সে প্রেসের অংশীদার ছিল তারাও নানা-রোগে আক্রান্ত হয়ে তিন জনই পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। অসৎ পথে উপার্জন সবাইর বোধ হয় সহ্য হয়না।

কন্ট্রোলার অফ প্রিন্টিং-এর অফিসে কাজ বিতরণে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য মাঝে মাঝে অফিসারের সংগে দেখা করতে যেতাম। গেলেই দেখতাম বড় বড় প্রেসের মালিকেরা স্লীপ দিয়ে দর্শনাশায় বসে আছেন। আমি পরে গেলেও স্লীপ দেওয়া মাত্রই ডেপুটি কন্ট্রোলার (পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে এই বিভাগে এটি সর্বোচ্চ পদ ছিল) কাজেম আলী সাহেব আমাকে সমাদর করে ডেকে নিয়ে বসাতেন। চায়ের অর্ডার দিয়ে থ্রি ক্যাসেল সিগারেট-এর প্যাকেটটি এগিয়ে দিতেন। তারপর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর কাজ কর্মের কথা উঠলে আমি যখন বলতাম গত কয়েক মাসের মধ্যে ভাল কাজ একটাও পাইনি, কিন্তু বড় বড় চার পাঁচটি প্রেস এর মধ্যে অনেকগুলি ভাল কাজ পেয়ে গেছে তখন কাজেম আলী সাহেব সংশ্লিষ্ট কেরানীকে ডেকে বলতেন দেখুনতো অমুক অমুক প্রেস কয়টি টেণ্ডার পেয়েছে আর পাইওনিয়ার কয়টি পেয়েছে? কেরানিটি একটু পরে যে হিসাব নিয়ে আসতো তাতে দেখা যেতো আমরাও গত কয়েক মাসে ৮/১০ টি টেণ্ডার পেয়েছি এবং কৃপাভাজন প্রেস গুলিও ঐ সমান সংখ্যক টেণ্ডারই পেয়েছে। এই হিসাব দেওয়ার পর তৎক্ষনাৎ জবাব দেওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হতো কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি আমাদের মত সাধারণ প্রেস ও ভাগ্যবান প্রেসগুলির টেণ্ডার সংখ্যা সমান হলেও আইটেম সংখ্যা এক হতো না। আমাদের মোট টেণ্ডারগুলিতে সর্বসাকুল্যে হয়তো কাজের মূল্য হবে ৩০/৪০ হাজার টাকা, এতে প্রায় সবই ফরম, দু'চারটি বই থাকলেও তাদের সংখ্যা ১০/১২ হাজারের বেশী নয়—নম্বরের কাজ নেই বললেই চলে। আর তাদেরকে যেগুলি দেওয়া হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই বই এবং তাতে নম্বর ও পারফোরেশান-এর কাজ প্রচুর এবং সংখ্যা ও বিপুল-ফলে বিল হবে দুই থেকে আড়াই লাখ।

www.pathagar.com

টেণ্ডারের আইটেমের মধ্যে এরূপ কারচুপি অফিসারের নির্দেশে হতো এতে কোন সন্দেহ নেই। কলিকাতার এন্থনি বাগানের একটি পুরানো-মৌরশী প্রেস ছাড়া এসব ভাগ্যবান প্রেসের প্রায় সবাই কম বেশী লাভের একটা অংশ যে কাজেম আলী ও উপরের জাঁদরেল অফিসার এন, এইচ সেকান্দরকে দিতেন এটা প্রায় সবাই জানতো। এটা একটা লাইনের ব্যাপার আমরা এ লাইন ছিলাম না এবং চেষ্টা করলেও এলাইনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম কিনা সন্দেহ। দেশব্যাপি বর্তমানে অবশ্য এ লাইনের কারবার পুরোমাত্রায় চলেছে। পরবর্তীকালে আমি গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি চেষ্টা করলেও লাইনে আমি ঢুকতে পারতাম না—তার কারণ অফিসারদের সংগে প্রথম থেকে আমি সত্য, সাধুতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতাম। তখন সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে কি ভাবে ভাল ভাবে সাধারণ মানুষের আকাঙ্খা অনুযায়ী গড়ে তোলা যায় এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতাম। ব্যক্তিগত লোভ লালসার জন্য দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে আমাদের সাধের পাকিস্তানরূপ ইমারতের ভিত্তির একটি ইট সরিয়ে দিয়ে একে ধ্বসে পড়তে সাহায্য করা, অফিসারের সংগে দেশ সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে এসব মতামত প্রকাশ করতাম।

আমরা যারা পাকিস্তান আন্দোলনের সংগে সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম তারা মনে প্রাণে এই মনোভাবই পোষণ করতাম। কাজেম আলী সাহেবের সংগে এসব আলোচনার সময় এটা যে আমার মনের কথা তা তিনি অনুভব করতেন। কিন্তু কাজেম আলী সাহেবের মতো কিছু লোকেরা বরাবরই যারা সরকারী চাকুরীতে ছিলেন, দেশ প্রেমের বালাই যাদের মোটেই ছিল না আমার এসব মতামত যে তাদের বিব্রত করে তুলতো এটা আমি তখন ভুলেও বুঝতে পারিনি। তখন সবে পাকিস্তান হয়েছে। সরকারী অফিসারদের মধ্যে উচ্চপদের কেউ কেউ এই সুযোগে হঠাৎ বড় লোক হওয়ার সম্ভাবনাকে হাত ছাড়া করতে রাজী ছিলেন না। মূলতঃ বিহার, পরে কলকাতার অধিবাসী কাজেম আলী তাদের মধ্যে একজন আমি তাকে শিক্ষিত, সুন্দর, রুচিবান, দেশপ্রেমিক অফিসার মনে করে তার একনিষ্ঠ সেবা দেশ গঠনের পক্ষে পুরোপুরি যাতে নিয়োজিত হয় তার জন্য এসমস্ত আলোচনার সূত্রপাত করতাম, কিন্তু তিনি যে পথে প বাড়িয়েছিলেন, সে পথে আমি একটি শক্ত কন্টক এবং আমাকে যতদূর

www.pathagar.com

সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই যে তার নীতি হবে এটি আমি তখন মোটেই অনুধাবন করতে পারিনি।

আমি যতই নীতি ও দেশপ্রেমের কথা বলেছি তার মনোভাব যে ক্রমশঃ ততই কঠিনতর হয়েছে এটা আমি বুঝতে পেরেছি অনেক পরে। আমি যে গর্ধভের মত উলু বনে মুক্তা ছড়িয়ে পণ্ডশ্রম করছিলাম এবং নিজের ভবিষ্যত ফর্সা করে দিচ্ছিলাম এই জ্ঞান আমার হয়েছিল অনেক দিন পরে। পরবর্তী কালে নিজের নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকির কথা স্মরণ করে নিজেই লজ্জিত হয়েছি।

এই নির্বুদ্ধিতা শুধু যে সে সময় করেছি এমন নয় পরবর্তী কালেও অনেক ক্ষেত্রে এর পুনঃরাবৃত্তি ঘটেছে। আমি সবাইকে নিজের মত দেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ মনে করে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে নীতি কথা শুনিয়ে যেতাম আর তারা হয়তো আমাকে একটি আস্ত উজবুক মনে করে নীরবে হাসতো। যাই হোক কাজেম আলী সাহেব দর্শন প্রার্থীদের মধ্যে আমাকে সবার আগে ডেকে চা সিগারেট খাইয়ে সম্মান বেশী দেখাতেন কিন্তু কাজ দিতেন না। যারা প্রায় অশিক্ষিত, চেক লিখতে গিয়ে কলম ভাংগার জোগাড় করতো, স্লীপ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে অসম্মানবোধ করতো না, প্রতি সপ্তাহে দু'তিন দিন তার বাসায় যাওয়া আসা করতো, কাজ দিতেন তাদের। আমার ভাগ্যে জুটতো সম্মান ও তাদের ভাগ্যে জুটতো টাকা। পরবর্তী কালে এসব ঘটনা আমার মনের উপর গভীর ভাবে ক্রিয়া করে আমাকে অনেকটা বাস্তববাদী করে তুললো। তখন বিবেকে অল্প সল্প আঘাত লাগলেও, কিছু কিছু রক্তপাত ঘটলেও তাকে বিশেষ আমল দিতাম না। ফেরৎ দিবে না জেনেও অফিসারদের টাকা ধার অর্থাৎ ঘুষ দিতে যখন আরম্ভ করেছি সে-সময়টা পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। প্রয়োজনের খাতিরে অবস্থার চাপে মনকে তখন অনেকটা আপোষধর্মী করে ফেলতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু মনের উপর এই অত্যাচার ধীরে ধীরে আমার তেজ এবং আমার জীবনী শক্তিকে যে ক্ষয় করে আনছিল এটা বুঝতে পারছিলাম।

আর এটাও বুঝতে পেরেছিলাম এই সমাজে আমাদের মত লোকের মূল্য কতটুকু। পরবর্তী কালে ব্যবসায়ে যখন কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, অনেক

www.pathagar.com

বড় বড় অফিসার ও দু'চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে তখন অনেকেই আমার কাছে আসত কোন অফিসার বা মন্ত্রীর কাছে কোন ব্যাপারে একটুখানি সুপারিশ করার জন্য। আমি তাদের বলতাম আমার সুপারিশে কোন কাজ হবে না, অন্যের কাছে যাও। তারা বলত কেন? আপনাকে ত তারা বেশ সম্মানের চোখে দেখে মনে হয়। আমি বলতাম ঐ সম্মান পর্যন্তই। সমাজটা আজ এমনই হয়েছে একজন অফিসার আমার কথা শুনবে যদি সে বুঝে যে কথা না রাখলে আমি তাকে বাঁশ দিতে পারব অর্থাৎ তার ক্ষতি করতে পারব। আর না হয় যদি বুঝে যে আজ আমার অনুরোধ রাখলে কাল আমার দ্বারা তার কোন উপকার হতে পারে, তখন আমার কথা রাখবে। এটা অনেকটা গিভ এণ্ড টেকের মত। কিন্তু আমার যেমন ক্ষতি করবার ক্ষমতা নেই তেমনি উপকার করবারও সামর্থ নেই এটা সবাই জানে, তাই আমার অনুরোধ সহজে কেউ রাখবে না। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এ জ্ঞান আমার হয়েছে। নিজের প্রয়োজনে ইহজীবনে আমি কোন দিন কাউকে কোনও ব্যাপারে বিশেষ অনুরোধ করেছি বলে মনে পড়ে না তবে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়ে যখন দু'চার জনকে অনুরোধ করেছি তখন তার মধ্যে এক আধজন সময় সময় আমার অনুরোধ যে না রেখেছেন এমন নয় তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ, তাই এব্যাপারে আমি সর্বদাই সতর্ক।

আমার বাবা মরহুম আবদুল মতিন বিএ বিটি ছিলেন শিক্ষক—সারা জীবন তার কাছে শুধু নীতি কথাই শুনেছি। আমার পিতাকে জীবনে কখনও অন্যায়ের সংগে আপোষ করতে দেখিনি। তিনি ত্রিশ দশকের দিকে ঢাকায় টেকস্টবুক সিলেকশন কমিটির মেম্বার ছিলেন। তদানীন্তন ঢাকার পাবলিশাররা তাদের বই অনুমোদন করাবার জন্য কতভাবে তার সংগে দেখা করতে চাইতো। তিনি কারো সংগে দেখা করতেন না এবং কাউকে বাসায় ঢুকতে দিতেন না। এক বার আমার মনে আছে যখন আমার বয়স ৭/৮ বৎসর হবে এক পাবলিশার আব্বার অনুপস্থিতিতে আমাদের বাসায় এসে আমার হাতে একটি হাত ঘড়ি পরিয়ে দিয়ে চলে যায়। এটা ছিল ছেলের হাতে মোয়া দিয়ে মায়ের মন পাওয়ার চেষ্টা। আব্বা বাসায় ফিরে ঘড়িটা দেখে খুলে নিয়ে পা দিয়ে চেপে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। পরে শুনেছি ঘড়ি কে দিয়েছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে পাবলিশারের যে দুইটি বই রিকমেণ্ড করবেন বলে স্থির করেছিলেন

www.pathagar.com

সে গুলিও বাতিল করে দেন। তাই ছোট বেলা থেকেই মনের বিশেষ কাঠামো নিয়ে আমি গড়ে উঠি। এরপর রাজনৈতিক জীবনেও এমন কতকগুলি মৌলিক ভাবধারার আমি সম্মুখীন হই যা স্থায়ীভাবে আমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমন কতগুলি মানুষের সন্নিধানে আমি এসেছিলাম যাদের নির্লোভ চরিত্র, দেশপ্রেম, সাধারণ মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার আমার মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বি.এ পাশ করার পর প্রথম জীবনে আমি '৪৩ সনে কলকাতায় রেশনিং ডিপার্টমেন্টে সাব-ইন্সপেক্টরের চাকুরীর নেই ৯২ টাকায়। তেরদিন চাকরির পরই একটা নীতির প্রশ্নে আই, সি, এস, কে, রামের সংগে মারামারি করায় আমার চাকরি যায়। তারপর বেশ কিছু-দিন বার্মা ইভাকুই অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হিসাবে চাকুরি করি। শেষ চাকুরি করি বেলতলা থানায় ট্রান্সপোর্ট ইন্সপেক্টর হিসাবে মাইনা ১৩৫ টাকা। তখনকার ১৩৫ টাকা এক গাদা টাকা, আজকের দিনের প্রায় পাঁচ হাজার টাকার সমান। তখন যুদ্ধের সময়। যে তিনটি চাকুরির কথা উল্লেখ করেছি তার প্রত্যেকটিতে অল্প বিস্তর উপরি নেওয়ার সুবিধা ছিল, বিশেষ করে শেষটিতে উপরি আয়ের সুবিধা ছিল বিলক্ষণ। তখন যুদ্ধের সুযোগে মটর গাড়ীর পার্টসের দেদার ব্ল্যাকমার্কেটিং হচ্ছিল। আমার কাজ ছিল কলকাতার বড় বড় মটর পার্টসের দোকানগুলিতে গিয়ে তাদের লেজার ক্যাশ মেমো প্রভৃতি চেক করা। তাদের দোকানে গেলে সমাদর করে বসিয়ে এক গ্লাস দামী শরবত, পান, সিগারেট প্রভৃতি দিয়ে যেতো। মাঝে মাঝে তাদের খাতায় কিছু অসংগতি ধরা পড়তো, ওয়ারনিং দিয়ে নোট লিখে চলে আসতাম, ইচ্ছা করলে চাপ দিয়ে কিছু টাকা পয়সা মে নিতে না পারতাম তা নয়—তবে এ খেয়াল কখনও হতো না। সিগা-রেট, শরবত যদিও খেতাম সেটাকে ঘুষ বলে মনে হতো না।

সত্তর দশকের প্রথমে আওয়ামী লীগের টিকেটে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন দেখেছি আমার সহকর্মীদের মধ্যে এক-আধ জন সুযোগ পেলেই কিছু বানাবার চেষ্টা যে না করতেন এমন নয়। আমাদের হাতে তখন লাইসেন্স পারমিট দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা। সুযোগ

www.pathagar.com

সন্ধানীরা, ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা আমাদের খুশী করবার জন্য সদাই ব্যস্ত। আমি লক্ষ্য করেছি সিগারেটের প্যাকেট পকেট থেকে বের করে খালি দেখে ফেলে দেওয়ার একটু পরেই একজন এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসে হাজির হতো। আমি দাম দিতে চাইলে সবিনয়ে জানাতো দাম দিতে হবে না। আমি যখন জিজ্ঞাসা করতাম আপনাকে আমি সিগারেট আনতে বলেছি? লোকটা তখন হকচকিয়ে যেতো—ভাবতো এ কেমন ধরনের লোক। আবহমানকাল থেকে নেতাদের দেখেছে—ভক্তদের ও সাধারণ লোকের কাছ থেকে এভাবে নজরানা নিতে, এতে নেতারাও খুশী হতো, ভক্তরাও আপ্যায়িত হতো। আমি কারো কাছ থেকে সিগারেট বা অন্য কিছু নিতাম না কারণ আমি জানতাম লোকটির কাছ থেকে সিগারেট নেওয়ার একটু পরেই সে একটি টিনের পারমিটের দরখাস্ত আমার সামনে তুলে ধরবে। একবার তার কাছ থেকে কিছু নিলে তাকেও আমার কিছু দিতে হবে।

আমি মেম্বার হওয়ার আগে ও পরে বহু আওয়ামী লীগের মিটিং এ যোগ দিতে অথবা এলাকার লোকের কাজের জন্য নিজের গাড়ীতে গিয়েছি। মিটিং এর উদ্যোক্তারা অনেক সময় পেট্রোলের দাম দিতে চাইলেও আমি নিতাম না। আমার এই আচরণে অনেক কর্মী অবাক হতো এবং তাদের কাছে শুনেছি কোন কোন জেলা পর্যায়ের নেতা এক গ্যালনের জায়গায় দু'ই গ্যালনের দাম সভার উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এলাকায় যেসব লোকের কাজ নিয়ে ডি.সি. বা এস.ডি.ও.র কাছে আমি যেতাম অনেক সময় তারা তেলের খরচ দিতে চাইলে আমি নিতাম না। এতে তারা অবাক হয়ে যেত।

যাই হউক দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এবং স্বাধীনতার কিছু দিন পরেও মনে আমার যেটুকু তেজ ছিল, সত্যও ন্যায়নীতির প্রতি যেটুকু আকর্ষণ ছিল আজ যখন নিজেকে বিশ্লেষণ করি বুঝতে পারি নিজের অজান্তে গত কয়েক বছরে মানসিক অপমৃত্যুর দিকে কতখানি এগিয়েছি। এভাবে অপমৃত্যু যে শুধু আমার ঘটেছে তা নয়। আলাপ করে দেখেছি আমার পরিচিতদের মধ্যে, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে এভাবে মরতে মরতে বিবেক বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত বহু দিনের পুরানো পেশা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে অতি কষ্টে জীবন যাপন করছে। আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যিনি পঞ্চাশ দশকে বইয়ের ব্যবসা মোটামুটি ভালই করেছিলেন, কিন্তু ষাটের

www.pathagar.com

দশকে টেকস্টবুক বোর্ডের দুই বড়কর্তা দুই মাহমুদের দুর্নীতির দৌরাত্মে বাধ্য হয়ে বইয়ের ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। আমার আরেক বন্ধুকে জানি যিনি আইন ব্যবসাতে বেশ ভাল করছিলেন। হঠাৎ আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কোল্ড ষ্টোরেজ ব্যবসা করতে গিয়ে এখন বেশ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম কেন তিনি এত প্রসারমান আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে আলুর ব্যবসায় এলেন তখন দুঃখ করে বললেন, যখন দেখলাম শুনানী না হয়ে হাকিমের কামরা থেকে ইনজাংসন নিয়ে যায়, টাকার জোরে জামিন হয়ে যায়, বিচারের নামে অনেক ক্ষেত্রে প্রহসন চলে তখন এক সময়ের এত সম্ভ্রমনী পেশার প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেল। তাই এই ব্যবসায়ে চলে এলাম কিন্তু এখানে এসেও শান্তি পাচ্ছি না।

দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশকে সুস্থ করার ইচ্ছায় গত কয় বৎসরে চেষ্টা কম করিনি। বহু মন্ত্রীর সংগে, বহু সেক্রেটারীর সংগে গত আট বৎসরে দেখা করে তাদের সমাজের ক্রম-বর্দ্ধমান ক্ষত ও মূল্য বোধের অবক্ষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'—কে কার কথা শোনে ?

মন্ত্রী এবং সেক্রেটারীদের এ সর্বনাশা বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে অনেক সময় তাদের বক্তব্য শুনে রাগে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে। শিল্প বা বাণিজ্য মন্ত্রীদের দেখেছি এসব বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান তাদের এত সীমাবদ্ধ যে তারা সেক্রেটারিদের ব্রিফিংএর উপরেই তাদের বক্তব্য রাখেন—আর না রেখেই বা করবেন কি ? তাঁদের অধিকাংশই পূর্বে হয় ওকালতি করতেন আর না হয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গত কয়েক বৎসরে অবশ্য দু'চার জনকে হিসাব রক্ষার ন্যায় অন্য পেশা থেকেও আসতে দেখেছি। মন্ত্রী হিসাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়ীত্ব পালন করতে গেলে শিল্প সংগঠন, তার কাঁচামাল, উৎপাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে একজন মন্ত্রীর যেমন কিছুটা হলেও মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার তেমনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিচালনা করতে গেলেও মন্ত্রীর অর্থনীতির জটিল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি কার্যকরী জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ওকালতি, রাজনীতি ও হিসাবজীবী পেশা থেকে যারা এসেছেন তাদের কারও প্রায় কোন বাস্তব জ্ঞান না থাকায় সেক্রেটারিদের পরামর্শের উপর তাদের প্রাধানতঃ নির্ভর করতে হয়েছে। আর এ সমস্ত সেক্রটারিদের অধিকাংশই

www.pathagar.com

ছিল সি,এস,পি অফিসার যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে নিজেদেরও বাস্তব জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। তারাও অধীনস্থ অফিসারদের রিপোর্ট ও মতামতের উপর নির্ভর করে সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত নিতেন।

পাকিস্তানের প্রথম আমল থেকে সি,এস,পি অফিসাররই বলতে গেলে সত্যিকারভাবে দেশ পরিচালনা করে আসছেন। তাদের অধিকাংশের মধ্যেই দেখেছি তাঁরা সবজান্তা সব কিছু বুঝেন সর্ব বিষয়ে পারদর্শী, দেশে তারাই সর্বাপেক্ষ জ্ঞানী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এমনি অহমিকায় পরিপূর্ণ। সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের দেখেছি আপরিমেয় অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য। আমার এক সি,এস,পি বন্ধুকে তাদের এই মনোভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানে ট্রেনিং-এর সময় তাদেরকে সব সময় বলা হ'ত যাদেরকে তোমরা শাসন করবে তাদের চাইতে তোমরা সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ একথা মনে রাখতে হবে। মনের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ না থাকলে সঠিকভাবে দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতে পারবে না।

পশ্চিম পাকিস্তানে যে একাডেমিতে তাদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং যে কারিকুলাম অনুসরণ করা হ'ত তার প্রবর্তক ছিল আই, সি, এস, অফিসাররা ইংরেজ আমলে যাদের তৈরী করা হয়েছিল পরাধীন ভারতবাসীকে শাসন করার জন্য। তাই এদের হাতে তৈরি সি, এস, পিরা যে এরূপ উন্নাসিক মনোভাব নিয়ে দেশ শাসন করতে আসবে এতে আশ্চর্যের কি আছে? সমগ্র ভারতে যেখানে সারা বৎসরে ৮/১০ জন আই, সি, এস হত সেখানে একমাত্র পাকিস্তানে যখন দুই ডজন সি, এস, পি, হতে আরম্ভ হল এবং ইংরেজ আমলে আই, সি, এসরা যেখানে জেলার ভার পেতে বার চৌদ্দ বৎসর লাগত সেখানে সি, এস, পিরা চার পাঁচ বৎসর চাকুরীর পরই তিরিশের কম বয়সে ডি, সি হয়ে জেলার ভার পেতে আরম্ভ করল তখন অনেক সি, এস, পির দাপটে, উদ্ধত আচরণে দেশবাসী ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক ছাড়তে আরম্ভ করল। এরূপ তরুণ অফিসারদের বিপথগামী করার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী, টাউট মোসাহেবদেরও অভাব ছিলনা। অতি অল্প বয়সে অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অনেক তরুণ সি, এস, পি অফিসারই মনের ভারসাম্য হারিয়ে এমন আচরণ করেন যা দেশে অত্যন্ত সমালোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুধু দেশবাসী নয় প্রশাসনের

www.pathagar.com

অন্যান্য অনেক অফিসারেরও মর্ম পীড়ার কারন হয়ে উঠেছিল। শাসন বিভাগে অনেক বি, সি, এস অফিসার ছিলেন যারা বয়সের কারনে সি, এস, পি পরীক্ষা দিতে পারেননি কিন্তু লেখাপড়া ও প্রশাসনের অভিজ্ঞতার দিক থেকে তারা অনেক বেশী যোগ্য হওয়া সত্বেও সি, এস, পিদের জুনিয়ার হয়ে যাওয়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে অপমানিত ও মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করেছেন। মদ ও আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রতি অত্যাসক্তি তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেশের আপামর জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তরুণ বয়সে বিভিন্ন জেলায় কর্মকর্তা থাকার সময় প্রদাধিকার বলে এরা স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গার্লস স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান থাকার সময় সুন্দরী ও যুবতী শিক্ষায়িত্রীদের নিয়োগ প্রমোশন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দানের ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা তাদেরকে নানা আপত্তিজনকভাবে ব্যবহার করে বহু মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারে অশান্তির আগুন জেলে দিয়েছিল। পরিচালনা কমিটির অন্যান্য মেম্বাররা কমিটির চেয়ারম্যান যেহেতু জেলার কর্তা তাই তাদের আচরণ অন্যায় বুঝেও প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি।

মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা বহু সি,এস,পি অফিসারকে এমনি ইন্দ্রিয় বিলাসী করে তুলেছিল যা শেষ পর্যন্ত তাদের পারিবারিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। সত্তর দশকের শেষ ভাগে এধরনের অফিসারদের মধ্যে জনা বারয়েক পরস্পরের সংগে বউ বদল করতে পর্যন্ত দেখা গেছে। মোটের উপর আমাদের বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত মুল্যবোধকে গুড়িয়ে দিয়ে সমাজে উপর তলার মানুষগুলির মধ্যে অত্যাধুনিক অশালীন ও বিজাতীয় ভাবধারার জোয়ার আনতে এদের অবদান বড় কম ছিল না।

সি, এস, পি, অফিসারদের অনেকেরই এই উন্নাসিকতা ও নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে কল্পনা করার ব্যাপারে পরিস্থিতি, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির জন্য আমরা নিজেরাও কম দায়ী নই। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে সি, এস, পি, জামাই পাওয়ার জন্য বাঙ্গালী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকেই পাগল হয়ে উঠে। যে কোন ভাবে হোক সি, এস, পি, জামাই ধরার জন্য দেশব্যাপী সে দুই দশকে যে

www.pathagar.com

উন্মত্ত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অনেকের মনে আছে। সে সি, এস, পি জামাই কোন পরিবার থেকে এসেছে, তার সঙ্গে মেয়ের পরিবারের শিক্ষা দীক্ষা আচার আচরণে খাপ খাবে কিনা এটাও অনেকে বিবেচনার মধ্যে আনেনি। এর ফল অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে দেখেছি। সাধারণ ঘরের ছেলে সি,এস,পি হওয়ার পর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বিয়ে করে চিরদিনের জন্য মা-বাবা, ভই-বোনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ গরীব বাপ বহু কষ্টে লেখা পড়া শিখিয়ে সি,এস,পি হওয়ার পর চিরদিনের জন্য ছেলেকে হারাল। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক উঠতি ধনী শ্বশুর গরীব ঘরের মেধাবি ছেলেক কলেজে থাকতেই জামাই করে নিজের খরচে পাশ করিয়ে বহু চেষ্টায় জামাইকে সি,এস,পি করার পর বাকি জীবন বাপ মেয়ে দুজনেই চোখের পানি ফেলেছে।

এক সময়ের সি, এস, পি, জামাই এর জন্য উন্মাদনার স্থান আজকাল দখল করেছে বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা মেজর কর্নেল জামাই পাওয়ার আগ্রহ। বাংলাদেশ হওয়ার পর সি,এস, পি ও বি, সি, এস, ক্যাডার এক হয়ে যাওয়ায় সি এস, পিদের পূর্বকার চার্ম আর তেমন নেই। তাছাড়া সি, এস, পিরা এখন যে মাইনা পায় তা দিয়ে হাই সোসাইটিতে বৌ-এর শাড়ী ও কসমেটিকের খরচ জোটানোই মুস্কিল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর কয়েক বৎসরে বাংগালী বেশ কিছু কোটিপতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির জন্ম হয়েছে যাদের বিলাস বহুল জীবনযাপন অনেক মৌরসী বিত্তবান লোকেরও ঈর্ষার কারণ হয়ে বাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, গুলশান লালমাটিয়া, বনানী প্রভৃতি এলাকাতে হালে বহু উঠতি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারেরা তাদের প্রচুর আয় থেকে চমৎকার সব বাড়ী করেছে যেগুলির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সামরিক বিভাগের ক্ষমতাশালী অংশের সাহায্য সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করে। তাই জামাই খোজার ব্যাপারে বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের সঙ্গে মেজর, কর্নেল পদমর্যাদার অফিসারদের ও চাহিদা বৃদ্ধি বর্তমানে বেশ লক্ষণীয়।

তরুণ বয়সে এরূপ বলগাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বেশ কিছু সি,এস,পি অফিসার যে আচরণ করেছেন তার স্মৃতি আজও অনেকেই ভুলতে পারেন নি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দু'চার জন তরুন সি,এস,পি অফিসারকে দেখেছি যাদের আচরণ কখনো ভুলতে পারবনা।

www.pathagar.com

ঢাকার একটি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে একজন বড় কর্তা সি,এস,পির দেখা পেয়েছিলাম। আমাদের একটি জমি হুকুম দখলের ব্যাপারে মাস ছয়েক তার অফিসে আমাকে যেতে হত। এক সুন্দরী মহিলা প্রায়ই সে অফিসে বেলা দশটা এগারটার দিকে আসতেন এবং তিনি এসেই অফিসারের কামরায় ঢুকে পড়তেন। তার পর দেড় দু ঘন্টার পূর্বে বের হতেন না। এতক্ষণ তিনি সেখানে কি করতেন তা তিনি আর অফিসারটিই জানতেন। এদিকে আমরা ডজন খানেক দর্শন-প্রার্থী অপেক্ষা করে করে অফিসার ও মেয়েটির চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতাম। অনেক সময় বিরক্ত হয়ে পিয়নকে কার্ড ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে পিয়ন বলত ঐ মহিলা ভিতরে থাকা অবস্থায় তার যাওয়াত দূরের কথা খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারির পর্য্যন্ত ভিতরে ঢোকা নিষেধ। বাধ্য হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হত। অনেক দিন গিয়ে যখন শুনতাম মেয়েটি খানিকক্ষণ আগে ঢুকেছে তখন দেড় দু' ঘন্টা অপেক্ষা করার ভয়ে ফিরে আসতাম।

আমি আর এক তরুণ সি,এস,পির কথা শুনেছি যিনি কোন এক জেলার ডি,সি, থাকতে নিজের স্ত্রীকে অশেষ নির্যাতনের পর পাগল ঘোষনা করে হাসপাতালে আটকিয়ে রেখে অন্য মেয়েদের নিয়ে রাত্রি যাপন করতেন। শুনেছি সে জেলা শহরে কোন সুন্দরী মেয়ে তার নজরে এলে মেয়েটির বেকার ভাই বা ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনকে চাকুরী দিয়ে মেয়েটিকে হাত করবার ব্যবস্থা করতেন।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি মুনির নামে এক অবাঙগালী তরুণ সি.এস.পি. যশোর জেলার এক নিম্নপদস্থ সরকারী অফিসারের স্ত্রীকে ভাগিয়ে এনে ঢাকার পুরানো ডাক বাংলায় আটকিয়ে রাখে। পরে এখানে এই মেয়েটিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। মেয়েটিকে হত্যার পূর্বে পরবর্তীকালে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব সি.এস.পি. আলতাফ গওহরও এখানে নাকি প্রায়ই আসতেন বলে শোনা যায়। এ হত্যার কাহিনী তখন স্থানীয় অনেক পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল এবং দেশব্যাপী বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকে আর একজন অবাঙ্গালী অফিসারকে আমার মনে আছে। তিনি একদিন ইডেন বিল্ডিং থেকে তার বোনের বিয়েতে কার্ড

www.pathagar.com

ছাপাবার জন্য কতগুলি নমুনা নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারীর মারফত আমাকে আদেশ করলেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন যোগাযোগ বিভাগের একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। আমি তার পিয়নকে বললাম আমার যাওয়ার সময় নেই, দরকার হলে নমুনা দেখার জন্য তোমার বসকে আসতে বল। ঘন্টা খানেক পরে ডেপুটি সেক্রেটারী ভদ্রলোক এসে পাটুয়াটুলির বড় রাস্তায় গাড়ী রেখে সেক্রেটারীকে পাঠালেন আমার কাছে। গলিতে গাড়ী ঢোকানোর অসুবিধার কথা বলে সেক্রেটারী আমাকে কার্ডের নমুনা নিয়ে গাড়ীতে সাহেবকে দেখিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। এতে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। সেক্রেটারীকে বললাম আপনার মনিবকে গিয়ে বলুন আমার ট্রাক বা বাসের ব্যবসা নেই যে আমাকে তার পরোয়া করতে হবে। তার দরকার থাকলে তাকে প্রেসে আসতে বলুন, আমি যেতে পারব না। গরজ বড় বালাই, সুন্দর ছাপার জন্য আমাদের খানিকটা সুনাম ছিল বলে জানতাম বাধ্য হয়ে তাকেই আসতে হবে। খানিক্ষণ পরে অফিসারটি গম্ভীরভাবে প্রেসে এসে নমুনা পছন্দ করে গেলেন। পরে লোক পাঠিয়ে প্রুপ দেখলেন এবং পুরো দাম দিয়ে ডেলিভারী নিলেন। ভাগ্যিস ইনি পরে বাণিজ্য বা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কোন উচ্চ পদে অধীষ্ঠিত হননি। হ'লে আমাদের কপালে দুঃখ ছিল।

আর একজন বাঙ্গালী সি, এস, পি, অফিসারের কথা উল্লেখ করছি যিনি একজন দক্ষও যাঁদরেল অফিসার বলে বাংলাদেশের প্রশাসনে বিখ্যাত ছিলেন। চাকুরি জীবনের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়াও পরবর্তীকালে মন্ত্রী পর্যায়ে উঠার সৌভাগ্য এঁর হয়েছিল। ইনি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন এবং আমাদের তখন তুই তুমি সম্পর্ক ছিল। একে অন্যের বাসায় মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করেছি। দেশ বিভাগের কয়েক বৎসর পরে ঢাকায় এসে শুনলাম ইনি সি, এস, পি, হয়েছেন এবং পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে তার সহপাঠি যারাই তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে সবাই খানিকটা অপদস্থ হয়েছে। শুনেই আমি সাবধান হয়ে গেলাম নিজের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য। পারতপক্ষে তার ত্রিসীমায় ঘেঁষতাম না। একবার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হ'ল। যখন দেখা করলাম তখন আপনি বলে সম্বোধন ছাড়াও এমন ভাবে কথা বললাম যেন জীবনে এই প্রথম দিন তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। তারপর বহুবার বহু অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে দেখা হ'য়েছে কিন্তু পূর্ব জীবনে যে আমাদের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল

www.pathagar.com

ভুলেও এমন ইঙ্গিত করিনি। ট্রেনিং একাডেমীতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে তাদের যে শিক্ষা দেওয়া হত আমার সহপাঠি বন্ধুটি দেখলাম তা পুরো মাত্রায় রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। একেই বলে জিনিয়াস। ইংরেজ আমলের আই,সি,এস দের বিরাট আলখেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট তাদেরই অতি ক্ষুদ্র সং রন সি, এস, পি, অফিসারদের অনেকেই আচার ব্যবহারে নিজেদের আই,সি,এস এর সমতুল্য প্রমাণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে নিজেদেরকে যে অনেক সময় লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিলেন এ সম্পর্কে অনেকেই সচেতন ছিলেন না।

এক সময় অফিসারটি দাম্ভিক ও উন্নাসিক অফিসার বলে পরিচিত থাকলেও খুব দক্ষ সৎ অফিসার বলে এর প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু অফিসারটি অবসর গ্রহণের পর আরও একটু উপরে মানে মন্ত্রী পর্যায়ে উঠার পর শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রি হিসাবে জিয়া ও তার পরবর্তীকালে এমন কতগুলি নীতি গ্রহণ করেন যার ফলে কয়েকজন ভূইফোঁড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হঠাৎ কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যেতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর কয়েক বৎসরে কয়েকশত কোটিপতি সৃষ্টির ব্যাপারে এর অবদান সবচাইতে বেশী। সজ্ঞানে দেশের এত বড় ক্ষতি আর কোন অফিসার করেছে কিনা সন্দেহ আর এসব কাজ এমনি এমনি হয়নি, এর পিছনে নিগূঢ় কারণ ছিল বলে সবাইর বিশ্বাস। আশ্চর্য্য লাগে যে এলাকা থেকে নূর মোহাম্মদ চেয়ারম্যান ও ফেরদৌস খাঁর মত অফিসার আসতে পারে সেখান থেকে এরূপ লোক কি করে এল?

আবার ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকজন সি, এস, পি অফিসারকে দেখেছি যারা ট্রেনিং একাডেমীর শিক্ষা বোধ হয় পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। আলী হাসান বলে এক সি, এস, পি, অফিসারকে দেখেছি পুরোনো বন্ধু-বান্ধব, সে কেরানী হোক আর যাই হোক, দেখা পেলে আন্তরিকতার সঙ্গে গল্প করত। ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ উর্দু কবি রেজা আলী ওয়াসাতের ছেলে। কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে একটি ছেলে তার সঙ্গে বি, এ, পড়ত। জীবনে সে বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি। চট্টগ্রামের একটি সওদাগরি অফিসে কেরাণীর কাজ করত। এই আলী হাসান যখন চট্টগ্রাম বিভাগে কমিশনার হয়ে বদলি হল তখন এই কেরাণী সহপাঠি কোন কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আলী আহসান তাকে চিনতে পেরে জড়িয়ে

www.pathagar.com

ধরে। এই কেরাণী, আমি ও আলী হাসান ইসলামিয়া কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি। আমার এই কেরাণী বন্ধুটি আমাকে বলেছে এর পরে যখনই সে আলী হাসানের সঙ্গে দেখা করেছে আলী হাসান তাকে চা না খাইয়ে ছেড়ে দেয়নি। কেরাণী বন্ধুটি সঙ্কোচ প্রকাশ করলে আজী হাসান বলতে আমি সি, এস, পি, হয়েছি তুমি কেরাণী হয়েছ এত নসীবের খেলা, তা বলে পুরোনো বন্ধুত্ব অস্বীকার করব কেন? আমার সঙ্গেও যতবার আলী হাসানের দেখা হয়েছে খুব আন্তরিক ব্যবহার পেয়েছি।

ইকবাল করিম নামে আর একজন সি, এস, পি, অফিসারের কথা আমার বিশেষ সম্মানের সঙ্গে মনে পড়ে। এত ভদ্র ও সজ্জন সি, এস, পি, অফিসার আমার জীবনে আমি কমই দেখেছি। ইনি মাদ্রাজের এক ডিস্ট্রিক জজের ছেলে। ঢাকার হাসিনা মনযিলে বিয়ে করেছিলেন। ইনি মাঝে মধ্যে ভিজিটিং বা নিমন্ত্রণের কার্ড ছাপার জন্য ষাটের দশকে এত ভিড়ের মধ্যে পরোনো শহরে কষ্ট করে আমার প্রেসে যেতেন। তখন তিনি জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমি তাকে মাঝে মাঝে বলতাম আপনি এত কষ্ট করে প্রেসে আসেন কেন? টেলিফোন করলেইতো আমি লোক দিয়ে প্রুফ পাঠিয়ে দিতে পারি। তিনি বলতেন "মোহাইমেন সাহেব আপনি স্বাধীন ব্যবসায়ী, গরজ আমার, আপনি কেন লোক পাঠাবেন? দরকার যখন আমার আমি কষ্ট করে আসব।" তার ভদ্রতাবোধ ও নীতিজ্ঞান দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। তখন মনে হতো শরীফ ঘরের লোক সাধারণতঃ এ রকমই হয়।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি একজন বাঙ্গালী সি, এস, পি আদমজির শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যে বিরাট অবদান রাখেন তার তুলনা বিরল। সেটা ষাট কি একষট্টি সাল হবে আমার ঠিক মনে নেই। আদমজিতে এক মাসের উপর বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট চলছে। কর্তৃপক্ষ অটল। আদমজিতে থেকে কয়েকজন শ্রমিক নেতা এসে আমাকে ধরল সরকারের তরফ থেকে চাপ দিয়ে যে ভাবে হয় একটা মিটমাট করিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা বলল বাঙ্গালী শ্রমিকরা এদিকে ওদিকে দিন মজুরী করে কোনভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অবাঙ্গালী শ্রমিকরা অভাব অনটনে কাতর হয়ে কাজে যোগ দেবে মনস্থ করেছে।

www.pathagar.com

বলল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কোন মিটমাট না হয় তবে আগামী কাল বা পরশুর মধ্যে অবাঙ্গালীরা কাজে যোগ দেবে। এতে ধর্মঘট ভেঙ্গে গেলে বাঙ্গালী শ্রমিকদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কফিলউদ্দিন মাহমুদ তখন স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগের সেক্রেটারি। আমি গিয়ে তাকে ধরলাম এবং ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝালাম। তিনি আদমজির সমগ্র শ্রমিকদের স্বার্থে ম্যানেজার করিম সাহেবকে ডেকে এনে যথেষ্ট চাপ দিয়ে একটা সম্মানজনক সর্তে থর্মঘট মিটিয়ে দিলেন। শ্রমিকেরা অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের হাতে থেকে বেঁচে গেল। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের এ দুর্বলতা টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই সহজে মিটমাট করতে রাজি হচ্ছিল না। কফিলউদ্দিন মাহমুদ একরকম জোর করেই তাঁর সিদ্ধান্ত কোম্পানীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে একষট্টি সনে একবার এবং বাষট্টি সনে আর একবার কফিলউদ্দিন মাহমুদ মধ্যস্থতা করে সরকারী চাপের মারফত আদমজির শ্রমিক ধর্মঘট মিটিয়ে দেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে আমি আর একজন আদর্শ স্থানীয় ভদ্র ও রুচিবান সি, এস, পির নোয়াখালি জেলার ডি, সি হিসাবে দেখা পেয়েছিলাম। এর নাম মঞ্জুরুল করিম। ইনি দেখলাম যেমন সদালাপি, কর্মঠ, বুদ্ধিমান তেমনি তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তির লোক। কারও সঙ্গে একবার আলাপ হলে বিশ বৎসর পরেও তাকে চিনতে এবং স্মরণ করতে তার নাকি কোন অসুবিধা হয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামে এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এর বদলীর হুকুম স্থানীয় লোকের অনুরোধে সরকারকে দুই দুইবার বাতিল করতে হয়। এর থেকে বুঝা যায় এলাকার মানুষের কাছে ইনি কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আর একজন তরুন দেশপ্রেমিক সি,এস, পি অফিসারের সংস্পর্শে আমার আসার সুযোগ হয় যার কথা বহুদিন আমার স্মরণে থাকবে। এর নাম খন্দকার আসাদুজ্জামান। '৭১ সনের মুক্তি যুদ্ধের সময় ইনি ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে মুজিব নগরে প্রবাসী সরকারের অধীনে অর্থসচিবের দায়ীত্বভার গ্রহণ করেন। সে কয়মাস শত প্রতিকুলতার মধ্যেও তাকে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করতে দেখেছি। দেশে ফেরার পরেও তাকে কিছুদিন শিল্প বিভাগের সচিব হিসাবে দিনে সতের

www.pathagar.com

আঠার ঘন্টা পরিশ্রম করতে দেখেছি। স্বাধীনতার পরপরেই শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতন সরকারকে যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল দায়ীত্বে যারা ছিলেন তারাই জানেন সে সময়েকার প্রকৃত অবস্থা কি ছিল। একদিনের কথা আমার মনে আছে তাকে জিজ্ঞসা করেছিলাম ঃ বর্তমানে কল কারখানার অবস্থা কি? তিনি ক্লান্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন "Everything is at a mess, we dont know what to do।" জটিলতার কোথায় শেষ হবে জানিনা। স্বাধীনতার ঠিক পর পরই প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দিন সাহেবকে প্রশ্ন করেও একই উত্তর পেয়েছিলাম। খন্দকার আসাদুজ্জামান এখন কোথায় আছেন জানিনা। শুনেছি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে খুব বেশী একাত্ম হওয়ার ফল পরবর্তী কালে তার পক্ষে নাকি খুব শুভ হয়নি। মুজিব আমলের পরবর্তী সরকারগুলির সময় এই সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসারটিকে নাকি নানা ভাবে নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

উপরে আমি সৎ ও সজ্জন যে কয়জন সি,এস, পি অফিসারের নাম উল্লেখ করেছি তারা ছাড়াও এরূপ আরও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যাদের নাম আমি এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ইংরেজ আমলে যে কয়জন আই, সি. এস পরে সি, এস, পি হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চাকুরী করতে আসেন তাদের মধ্যে দুচারজন সাধুতা, ভদ্র আচরণ, দক্ষতা ও নিরহংকার ব্যবহারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে গভীর ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে জনাব ইসহাক, আসগর আলী শাহ্, জি, এ ফারুকী, ডব্লিউ বি কাদরী ও মাদানীর নাম আজও অনেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। এদেশের সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই আসগর আলী শাহের দ্বারা অর্থনৈতিক দিক থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। একদা পূর্ব বাংলা এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে জনাব ইস্হাক এত গভীরভাবে জড়িত ছিলেন যে তার নাম আজও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রবাদের মত হয়ে আছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর বর্তমান অবধি এই সি,এস,পি অফিসাররাই শিল্প বাণিজ্য পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক বিভাগগুলির প্রধান হিসাবে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে আসছে। সামরিক বিভাগের লোকেরা পঁচাত্তরের পর থেকে দেশ শাসন করলেও পরিকল্পনা, রাজস্ব, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মূলনীতি ও কাঠামো এরাই প্রণয়ন করে

www.pathagar.com

চলেছে। পঁচিশ বৎসরে পাকিস্তানে যেখানে বাইশ পরিবার কোটিপতি হলেছিল সেখানে বাংলাদেশ হওয়ার পর গত তের চৌদ্দ বৎসরে কোটিপতির সংখ্যা নাকি পাঁচ শত ছাড়িয়ে গেছে। এটাও এই সি,এস,পি, সেক্রেটারি-দের অর্থনীতি প্রণয়নের ফল। দেশীয় শিল্পকে প্রটেকশন দেওয়ার নামে তারা এমন এক অদ্ভুত নীতি গ্রহণ করে চলেছেন যার ফলে দেশের সাধারণ মানুষ শোষিত হয়ে সমগ্র অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত শোষণের ফলে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে। বাণিজ্য নীতির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয় ঘটছে। চার-দিকে আজ হতাশা ও দারিদ্র্য জনজীবনকে ঘিরে ধরেছে।

উন্নয়নের নামে সরকার বর্তমানে এমন সব কাণ্ড কারখানা করছেন যাতে প্রশাসন ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য নতুন নতুন ট্যাক্স বসানো হচ্ছে। অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারিদের বহুবার বলেছি নতুন ট্যাক্স না বসিয়ে গত কয়েক বৎসর যারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে ট্যাক্স দেয়নি তাদের ধরুন—কম পক্ষে দুহাজার কোটি টাকা পেয়ে যাবেন। উপায় হিসাবে তাদের বলেছি গত দশ বছরে কমপক্ষে দশ হাজার প্রাইভেট গাড়ির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এদের অধিকাংশই হল নতুন ব্যবসায়ীদের যারা এক পয়সাও ট্যাক্স দেয়নি। মোটর ভেহিকেলস ডিপার্টমেন্ট থেকে তালিকা আনিয়ে যারা কোন দিন ট্যাক্স দেয়নি তাদের বলা হোক বাপু দেড় লাখ টাকা দিয়ে যখন গাড়ি কিনেছ তখন দশ লাখ টাকা নিশ্চয় উপার্জন করেছ। অতএব দশ লাখ টাকার উপর সরকারের ন্যায্য পাওনাটা দিয়ে দাও।

গত কয়েক বৎসরে ঢাকার গুলশান ও বনানীতে চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার বাড়ী উঠেছে যে গুলির এক একটির মূল্য চল্লিশ পঞ্চাশ লাখের উপরে। শত শত বাড়ী বেচাকেনা হয়েছে যেগুলির মূল্য গড়ে পঞ্চাশ লাখের উপরে। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এবং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে খোঁজ নিলেই জানা যাবে কারা নতুন বাড়ী করেছে বা কিনেছে। তাদের ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেই হবে বাড়ী করার বা কেনার টাকা তারা কোথায় পেল, এযাবৎ কত ট্যাক্স দিয়েছে? সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে তাদের বলা হোক ফাঁকি দেওয়া অর্থের উপর

www.pathagar.com

ট্যাক্স দিয়ে দিতে। এভাবে হাজার দুয়েক কোটি টাকা অনায়াসেই সরকার যোগাড় করে নিতে পারেন যার ফলে কালো টাকাও কমে যাবে এবং নতুন টাকা ধার্য্যেরও দরকার হবে না। বহুবার সেক্রেটারি ও মন্ত্রীদের সঙ্গে এসব কথা আলাপ করেছি কিন্তু কারও কাছ থেকেই তেমন সাড়া পাইনি।

পনেরো পার্সেন্ট জরিমানা দিয়ে কালো টাকার বাকি অংশকে সাদা করার অভিনব সিদ্ধান্ত যা পাক-ভারত উপমহাদেশের আর কোথাও হয়নি, তা খুব সম্ভব প্রশাসনের সিনিরার সি, এসপিদের মাথা থেকেই বের হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে যারা ঠিক মত ট্যাক্স দিয়েছে তারা নির্বোধ প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার প্রবণতাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পূর্বে সি, এস, পি, অফিসারদের কারো কারো বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য মদাসক্তি খামখেয়ালিপনার অভিযোগ মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও ঘুষ ও অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জনের অভিযোগ কদাচিৎ পাওয়া গেছে কিন্তু গত কয়েক বৎসরে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যাতে মনে হয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে যেসব অফিসার আছেন তারা অনেকেই বাংলাদেশের নতুন কোটিপতিদের নির্দেশেই শিল্প ও বাণিজ্য নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। গত দু'তিন বৎসরের বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেসব আইটেমের শুল্ক কমাবার জন্য বা আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা বাতিল করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি বড় বড় চেম্বার অনুরোধ জানিয়েছে সে অনুরোধ না মেনে সরকার এমন সব আইটেমের শুল্ক অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে দিয়েছেন যার জন্য কোন চেম্বার বা ফেডারেশান কোন কালেই অনুরোধ জানায়নি এবং যা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক তো হয়ইনি বরং বিশেষ বিশেষ কোটিপতির ধনবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এসব ব্যাপার এমনি এমনি ঘটেনি। এর পিছনে নিগূঢ় কোন কারণ রয়েছে বলে ব্যবসায়ী মহলে জোর গুজব।

"আয় করে পরিশোধ কর" এই নীতি নীতি হিসাবে মন্দ নয়। কিন্তু বিদেশী সহযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রামে, সিমেন্ট, সূতা বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করা আর ঐ ভিত্তিতে বিদেশী সহযোগিতায় আয় হতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ট্রলারের ব্যবসা করা এক নয়। গত চার পাঁচ বছর ধরে ঐ

www.pathagar.com

ভিত্তিতে অনেক দেশীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে ঐ ধরনের ব্যবসা করতে দিয়ে সরকার প্রতি বৎসর বাংলাদেশ থেকে শত শত কোটি টাকার মাছ পাচারের সুবিধা করে দিয়েছে। বিদেশী সহযোগিতায় দেশীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে রপ্তানিমুখী কোন শিল্প গড়ে উঠলে তাতে দেশের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না, কারণ উৎপাদিত মালের পরিমাণ যাই হোক না কেন তা দেশের বাইরে পাচার হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। উৎপাদিত দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ সরকারের জানা থাকে। শুধু মাত্র অন্তর্জাতিক বাজারের চাইতে কম মূল্যে বিদেশী তারই কোন বেনামি ফার্মের কাছে বিক্রি দেখিয়ে সরকার ও দেশকে সম্পদের দিক থেকে খানিকটা ক্ষতিগ্রস্থ করা যায়, তবে এটা সব সময় সম্ভব নয়। আজ হোক কাল হোক এটা ধরা পড়ে যেতে বাধ্য। মোটের উপর প্রকৃত রপ্তানির পরিমাণ দীর্ঘদিন লুকানো সম্ভব নয়।

কিন্তু "পে এ্যাজ ইউ আর্ন" ভিত্তিতে থাইল্যাণ্ডের যে ট্রলারগুলিকে মাছ ধরার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তারা ধৃত মাছের চৌদ্দ আনাই বাংলাদেশের জল সীমার বাইরে দাঁড়ানো তাদের অপর বড় জাহাজে তুলে দিয়ে দেশকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। তাই দেশের মূল ভূখণ্ডে যৌথ উদ্যোগে শিল্প আর সমুদ্রে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রচেষ্টা যে এক হতে পারেনা, চরিত্রগতভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে বাধ্য এবং দেশের স্বার্থের জন্য ভয়ানক অনিষ্টকর এটা কি আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য নীতি প্রণেতারা জানতেন না? এই পার্থক্যটুকু বুঝবার জন্য গভীর অর্থনীতি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এই নীতি যারা প্রণয়ন করছেন বা সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন তাঁর জেনে শুনেই করেছেন। দেশের ক্ষতি হলে হোক আমার লাভ হলেই হল, এই চিন্তাই তাদের মনোভাবকে প্রভাবিত করছে মনে হয়।

এসব কারণে সরকারের ন্যায়নীতি যোগ্যতা এবং বাণিজ্য অর্থ ও শিল্প নীতি প্রণেতাদের সদিচ্ছা ও সাধুতার ব্যাপারে জনমনে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে তুলেছে। সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি আস্থাই জনসাধারণের মনোবলকে দৃঢ় রাখে, স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে প্রত্যেককে স্বীয় কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। এভাবেই সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেটা অপরিহার্য। কিন্তু গত এক দশক ধরে

www.pathagar.com

যে শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতি এদেশে অনুসৃত হচ্ছে তার ফলে গরীব আরও গরীব হচ্ছে। গত কয়েক বৎসরে শত শত কোটিপতি সৃষ্টিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কালো টাকা ছেঁকে তোলার পরিবর্তে এদের গৃহীত নীতি মুষ্টি মেয় লোকের হাতে দেশের সমুদয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই সাহায্য করছে। তাই এই মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নির্দেশেই বাজেট তৈরী হয় বলে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

এর ফলাফল যে দেশের ভবিষ্যতের জন্য কী মারাত্মক তা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। যেনতেন ভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। ন্যায় নীতি মূল্যবোধের স্থান কোথাও নেই। সাধুও সৎ লোককে আজ সবাই নির্বোধ মনে করে। এমন কি নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের কাছেও সে উপহাসের পাত্র। দেশে আইন, শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রতিদিনকার পত্রিকা খুললেই তার প্রমান পাওয়া যায়। আইন, শৃংখলার ক্রমাবণতি দেখে অনেকে মনে করে শীঘ্র হয়তো এমন দিনও আসতে পারে যখন দিনে দুপুরে রাহাজানির ভয়ে রাস্তায় বের হওয়া যাবেনা। সন্ধ্যার পর বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে লুটপাট আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। মানুষের প্রাণের চাইতে দেশ বড় নয়। যখন অধিকাংশ মানুষ দেখবে তার প্রাণই যেতে বসেছে তখন দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে কি ভাববে বলা শক্ত।

এও হল এক প্রকার আত্মার মৃত্যু, দেশের সার্বজনীন আত্মার মৃত্যু। মূল্যবোধ ও পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই হল দেশের প্রাণ, আজ সে প্রাণই মৃত্যুর পথে।

মন্ত্রী ও সেক্রেটারীদের সঙ্গে আলাপের পর বুঝেছি আমি শুধু পণ্ডশ্রম করে যাচ্ছি। কারও কিছু করবার তেমন আগ্রহ নেই আর থাকলেও সুযোগ নেই। সবাই সবার তালে আছে। সবাই সবাইর গদি রক্ষায় ব্যস্ত। নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি জেনেও তাই দেশের বাস্তব অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে বহমান স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াটাই আমি শ্রেয় বলে মনে করতে বাধ্য হয়েছি।

ব্যবসা জীবনে এসে প্রতিকুল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে মনের মৃত্যু বা সংকোচন শুল্ক বিভাগের অত্যাচারে যতটুকু হয়েছে অন্য বিভাগে বোধ

www.pathagar.com

হয় এর অর্ধেকও হয়নি। এই একটি বিভাগ যেখানে যত সৎ ও সাধু প্রকৃতির ব্যবসায়ী হোকনা একজনকে আমদানীকৃত মাল ছাড়াতে গেলে কিছু উপরি পাওনা না দিয়ে পার পাওয়ার উপায় নেই। এখানে বাংলাদেশ কাস্টমস্ ট্যারিফ নামে একটি বই আছে যাতে আমদানী যোগ্য সকল মালের বিস্তারিত বিবরণ, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিধির উল্লেখ থাকে। আমদানীকৃত প্রত্যেক জিনিষের একটা ক্লাসিফিকেশন থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিষের ব্যবহার প্রস্তুত প্রণালির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন গ্রুপে তাকে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন গ্রুপের শুল্কও বিভিন্ন প্রকার নির্দিষ্ট রয়েছে। ধরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্টস্ কেমিক্যালস্, ম্যাশিনারিজ প্রভৃতি। ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্টস্ কয়েকশ প্রকারের হতে পারে, তার বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার হতে পারে। যদি কৃষির জন্য হয় তার শুল্ক ৫০% হবে কিন্তু যদি অগ্নীনির্বাপক বা কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় তবে তার শুল্ক ১০০% ভাগ বা ১৫০% ভাগ হতে পারে। আবার এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্টস্‌কে যদি শিক্ষা বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি হিসাবে ব্যবহারযোগ্য প্রমাণ করা যায় তবে তার শুল্ক ১৫/২০% পার্সেন্ট হতে পারে। ধরুণ কেমিক্যালস্ একটি আইটেম। এটা যদি ঔষধ শিল্পের জন্য ব্যবহার হয় তবে তার শুল্ক ২০% পার্সেন্ট হবে। আবার যদি এটা প্লাসটিক বা অন্য শিল্পে ব্যবহারের জন্য হয় তবে তার শুল্ক ৫০% ভাগ হবে। আর যদি কস্‌মেটিক বা অন্য কোন বিলাস দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত হবে এ প্রমাণ করা যায় তবে এর ডিউটি ১০০% ও হতে পারে। এখন শুল্ক নির্ধারণকারী অফিসাররা মালের ইনভয়েসের উপর উল্লেখিত বিবরণের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি আবিষ্কার করে মালটিকে বর্ধিত শুল্কের তালিকায় ফেলে আমদানীকারককে বেশী শুল্ক দিতে বাধ্য করতে সব সময় চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুখন আমদানীকারক এপ্রেজার বা শুল্ক নির্ধারক অফিসারের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে আসতে বাধ্য হয়। আমদানীকারককে তার স্বমতে আনার জন্য শুল্ক অফিসারের হাতে তিনটি মারাত্মক অস্ত্র আছে। প্রয়োজন মতে এর যে কোন একটি ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ যত বিবেকবান এবং সৎ হোকনা কেন তাকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করতে পারে।

প্রথমটি হল মালের বিবরণ, ব্যবহার বিধি, প্রস্তুতি প্রকৃয়ার বিবরণে কোন খুত বের করে উঁচু হারের শুল্ক তালিকায় ফেলা। বি. সি. টি অর্থাৎ বাংলাদেশ কাস্টমস্ ট্যারিফ বলে যে বইটিতে আমদানী দ্রব্যের বিবরণ, তার

www.pathagar.com

ব্যবহার বিধি লেখা রয়েছে তার ভাষা এমনই জটিল ও কোন কোন ক্ষেত্রে এতই দুর্বোধ্য যে দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত তাকে ইচ্ছামত টেনে যে কোন দিকে নেওয়া যায় এবং শুল্ক অফিসারের প্রথম থেকে ঝোঁক থাকে সেদিকে।

দ্বিতীয়টি হল ইনভয়েসে যে দর উল্লেখ আছে সেটাকে অস্বীকার করে আনডার ইভয়েসিং বা ওভার ইনভয়েসিং নামে কোন এক অপরাধে আমদানীকারককে অপরাধী সাব্যস্ত করা। তৃতীয় হল মালের যে প্রস্তুতি বিবরণ ও প্রকৃতি আমদানীকারক ঘোষণা করেছে সেটাকে অস্বীকার করে টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পঠোবার প্রস্তাব করা। রপ্তানিকারী কর্তৃক প্রেরীত কাগজপত্র দেখিয়ে উপরে দেন দরবার করে প্রথমটা থেকে আপনি যদিও রেহাই পান, দ্বিতীয়টিতে আপনাকে দারুণভাবে জব্দ করা যেতে পারে। ধরুন পূর্ববর্তী কোন আমদানী কারক তিন মাস আগে পাঁচ টন বোর্ড এনেছে প্রতি টন ৪৮০ ডলারে। তিন মাস পরে আপনি ২৫ টন মাল আনলেন ৪০০ ডলার হিসাবে। যেহেতু আপনার মালের পরিমাণ অনেক বেশী তাই জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিকে খরচ অনেক কম এবং আপনি হয়তো অফসিজনে কিনেছেন তাই রপ্তানিকারক আপনাকে বিশেষ মূল্য হিসাবে টন প্রতি ৮০ ডলার কম অফার দিয়েছে। এতে বহু পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা বেঁচে গেল বলে দেশের উপকার হল। কিন্তু শুল্ক অফিসার নোট দেবে আপনি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য আণ্ডার ইনভয়েসিং করেছেন। শুল্ক বিভাগে কালেকটর বা ডিপুটি কালেকটর পর্যায়ে যে দু'চার জন ভাল লোক নেই এমন নয়। দরবার করে অনেকদিন অপেক্ষা করার পর আপনার ঘোষিত মূল্য হয়তো আপনি উপরের অফিসারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন কিন্তু ইতিমধ্যে আপনার ব্যবসায়ের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তা অবর্শনীয়। সময় মত বোড কারখানায় না পৌছার ফলে হয়তো আপনাকে কয়েক লক্ষ টাকার অর্ডার হারাতে হয়েছে। এছাড়া বোর্ড অনেকদিন পোর্টেপড়ে থেকে দেখবেন কয়েক বেল ড্যাম্প হয়ে পচে কাজের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি আপনার আমদানীকৃত আইটেম কেমিক্যাল হয় তবে সুদীর্ঘ দিন ধর দেন দরবারের পরে যখন মাল ছাড়ালেন দেখলেন ইতিমধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ আপনার মাল তিন চার জায়গায় স্থানান্তর করার ফলে ড্রাম ছিদ্র হয়ে অনেক মালই বেরিয়ে গেছে। তখন দেখা যাবে শুল্ক অফিসারের দাবী না মেটাবার ফলে আপনার লোকসান হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশী।

www.pathagar.com

শুল্ক অফিসারের হাতে তৃতীয় অস্ত্রের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেটা আরোও মারাত্মক। আপনি আমদানীকৃত মালের যে গুণাগুণ বৈশিষ্ট বা প্রকৃতি দাবী করছেন সেটা কেমিক্যালস্ হোক বা পলিষ্টার সূতা হোক আপনার বিবরণের সঙ্গে শুল্ক অফিসার একমত না হয়ে সেটাকে শুল্ক বিভাগের অন্তর্গত টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পাঠাবে যেখান থেকে তিন চার মাসেও রিপোর্ট আসবেনা। আপনি যতই তাগাদা দিননা কেন অফিসারের অভাব ইত্যাদি নানা অজুহাতে ছয় মাসেও আপনারা রিপোর্ট নাও আসতে পারে। তত দিনে দেখবেন আপনার ব্যবসার ক্ষতি যে শুধু হয়েছে তাই নয়, পোর্ট থেকে অধিকাংশ মাল দেখবেন ইতিমধ্যে হয় নষ্ট হয়ে গেছে নয়ত চুরি হয়ে গেছে। ইন্সিওরেন্স ক্লেইম করে সে ক্ষতিপূরণ করা আর আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

গত ২৫/৩০ বৎসরে মেশিনারী কিংবা কাঁচা মাল আমদানী করতে গিয়ে শুল্ক বিভাগ সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা যেমনি বিচিত্র তেমনি বেদনা-দায়ক। প্রথম প্রথম শুল্ক কর্তাদের সাথে নিজের বিবেকের নির্দেশে লড়াই করতে গেছি। আমার আমদানী করা জিনিষে যখন কোন ঘাপলা নেই তখন অযথা তাদের অন্যায় দাবীর কাছে নতি স্বীকার করব কেন?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি স্বীকার ও পরিশ্রমের পর বুঝেছি, 'যে দেশে যেই ভাও উল্টো করে নাও বাও' অর্থাৎ 'যতদিন রোমে আছ ততদিন রোমবাসীর ন্যায় আচরণ করিবে' এই নীতিই সব কথার সার এটা স্বীকার করতে হলো।

এখন আমি সব কমসাইনমেন্টে কাস্টমস ও জেটি কতৃপক্ষের জন্য কম হলেও হাজার খানেক টাকা উপরি ধরে দিই এবং যথা শীঘ্র এসে-সমেন্ট হয়ে মাল চলে আসে—অবশ্য কনসাইমেন্টের আকার ও মূল্যের উপর উপরির পরিমাণ নির্ভর করে। কখনও কখনও এটা ৫/৭ হাজারও হয়। কাজটা সর্বদা সমাধা হয় ক্লিয়ারিং এজেন্টের মারফৎ—আজকাল কোর্ট কাচারিতে হাকিমের পাওনাটা যেমন পেশকার, ইদানিং উকিলের মারফৎ সমাধা হয় তেমনি শুল্ক বিভাগে এটা ক্লিয়ারিং এজেন্টের মারফৎই সমাধা হয়ে থাকে। অবশ্য যখন শুল্ক নির্ধারক অফিসার একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে বা খাঁই একটু বেশী দেখায় তখন নিজে গিয়ে চট্টগ্রামে

www.pathagar.com

কাস্টমস কালেকটরের সঙ্গে দেখা করি এবং বহু ক্ষেত্রেই রিলিফ আগেও পেয়েছি এবং এখনও পাই।

বহুবার প্রিন্টিং মেশিন ছাড়াতে আমার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। গত কয়েক বৎসরে আমরা বহু রিকণ্ডিশনড্ মেশিন আমদানী করেছি। সাপ্লাইয়ার যদি মেশিনটি রিকণ্ডিশন্ করে বাইরে সামান্য একটু পেইন্টি- করে চক চকে করে দেয় তবে কাস্টমস অফিসার বলবে রিকণ্ডিশনড্ নাম দিয়ে নূতন মেশিন এনেছি অর্থাৎ আণ্ডার ইনভয়েসিং করেছি। আবার যদি সাপ্লাইয়ার পুরাণ মেশিনকে রিকণ্ডিশন করে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষয়ে যাওয়া পার্টসগুলিকে বদলে দিয়ে বাইরের দিকে রংচং না করে যেমন ছিল তেমনি রেখে দেয় তখন বলবে রিকণ্ডিশনড্ মেশিন না এনে—পুরান মেশিন এনেছি। অর্থাৎ ওভার-ইনভয়েসিং করেছি। আমি রিকণ্ডিশনড্ মেশিনই এনেছি এটা জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তখন বলবে কোন কোন পার্টস বদলান হয়েছে খুলে দেখান, যেটা ঢাকা থেকে উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে গিয়ে খুলে দেখিয়ে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই কিছু বাঁ হাতের কারবার করে আমার মত অন্যেরাও তাদের খুশি করতে বাধ্য হয়। আমি অবশ্য বেশ কয়েকবার চট্টগ্রাম গিয়ে কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে টাকা না দিয়েই মেশিন ছাড়িয়ে নিয়েছি। এব্যাপারে অন্যের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি না তবে চট্টগ্রামে আবুল হোসেন ও আকরাম সাহেব বলে দু'জন কালেক্টরের দেখা আমি পেয়েছি যাদের কাছ থেকে নিচের অফিসারদের অন্যায়ের প্রতিকার আমি সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি। এরা দু'জন আমাকে সব সময় বলতেন 'কোন অসুবিধা দেখলে আপনি আমাদের কাছে চলে আসবেন, এক পয়সাও খরচ করতে হবে না। আপনার দাবী যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে আমাদের সাহায্য আপনি সব সময় পাবেন।'

আবুল হোসেন সাহেব আমাকে প্রায় বলতেন লোকে টাকা খরচ করে নীচে থেকেই কাজ সেরে নেয়, আমার কাছে কেন আসেনা? আমি তাকে বলতাম দেখুন অধিকাংশ ব্যবসায়ী যে শ্রেণী বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে আসে তাদের সবারই কালেক্টর পর্যন্ত এসে দেখা করবার সাহস থাকে না। এ ছাড়া ছুটিছাটা নানা কারণে কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করা খুব সময়সাপেক্ষ ও ধৈর্য্যের ব্যাপার, আর সময় মানেই টাকা খরচ। তাই তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ হচ্ছে আপনাদের সিস্টেমের, প্রক্রিয়ার

www.pathagar.com

জটিলতার। এটা অবশ্য তিনি স্বীকার করতেন। আমার গত ২০/২৫ বৎসরের চট্টগ্রামের শুল্ক বিভাগের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় আকরাম সাহেবের মত সৎ ও সাধু প্রকৃতির লোক চট্টগ্রাম কাস্টমস্ হাউসে খুব কমই এসেছে। কাস্টমসের কোন অফিসার ভাল কি মন্দ এটা জানার সব চাইতে সহজ ও সঠিক উপায় হচ্ছে ক্লিয়ারিং এজেন্টদের জিজ্ঞেস করা। কোন্ অফিসারের আসক্তি কোনটায়, মদ, মেয়ে না টাকায়, ক্লিয়ারিং এজেন্টরা ঠিক বলতে পারে কারণ লেনদেনটা তাদের মারফৎ হয় কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমার জানা মতে সব ক্লিয়ারিং এজেন্টই আকরাম সাহেবের সুনাম করেছে। সৎ ও সাধু প্রকৃতির আরও দুচারজন অফিসার চট্টগ্রাম কাস্টমস এ চাকুরী করে গেছেন, তাদের অনেকে অবসর নিয়েছেন বা বর্তমানে চাকুরীতে আছেন—তাদের কথা আমি শুনেছি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ না হওয়ায় তাদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। একেবারে নিচের দিকে অর্থাৎ এ্যাপ্রেইজার লেভেলেও যে দুচারজন সৎ অফিসারের দেখা না পেয়েছি এমন নয় তবে তাদের সংখ্যা এত কম যে সমুদ্রে বিন্দুবৎ বলতে হবে। অর্থ উপার্জনের এত মারাত্মক জায়গায় থেকেও যে দু'চারজন এ লোভের উর্দ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন তাদের সত্যিই নমস্য ব্যক্তি বলতে হবে।

ঢাকা বিমান বন্দরে আমদানীকারকদের থেকে টাকা উসুলের আর এক অদ্ভুত উপায় দেখেছি। বিমানে আনা হয় সাধারণতঃ ছোট খাট জিনিষ যা সাধারণতঃ শিল্প কারখানাতে জরুরী কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন এসেসমেন্ট হওয়ার পর মাল ডেলিভারীর সময় দেখা গেল আপনার আমদানীকৃত মালের ছোট ছোট দশটি প্যাকেটের মধ্যে আটটি প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে আর দুটির খোঁজ নেই। এখন আটটি প্যাকেট যখন পাওয়া যাচ্ছে, আটটি প্যাকেটের উপরই যে আপনি শুল্ক দেবেন সে আইন নেই, আপনাকে দশটি প্যাকেটের উপরই ডিউটি, স্যালট্যাক্স দিতে হবে পুরো মাল না পেলেও। ভিতরে যেখানে মাল রাখা হয় সেখানে আপনি যেতে পারবেন না নিজে খুঁজে দেখবার জন্য। আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে বিমানের পিয়ন চাপরাসির ন্যায় ছোট ছোট কর্মচারীদের তথ্যানুসন্ধানের উপর। এ অবস্থায় আপনি যদি পিয়নকে ডেকে পকেটে কিছু গুঁজে দিয়ে বলেন ভাই একটু কষ্ট করে খুঁজে দেখ আর দুটো প্যাকেট পাওয়া যায় কিনা? দেখবেন দশ পনের মিনিটেই বাকী দুটো প্যাকেটও পাওয়া গেছে। এটা এখানের প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ শুল্ক নির্দ্ধারক কর্তাদের

www.pathagar.com

টাকা উসুলের যে প্রক্রিয়ার কথা পূর্বে বলেছি এখানে সে প্রক্রিয়া কমবেশী নেই এমন নয় তবে বোধ হয় তার ধারটা একটু কম। ঢাকা বিমান বন্দরে হংকং, সিঙ্গাপুর ও ব্যাংকক থেকে বেশীর ভাগই অবৈধ মাল আমদানী হয় কোটি কোটি টাকার বিলাস দ্রব্য ও ইলেকট্রনিক গুডস। আটককৃত মালের যে বিবরণ ও মূল্য তালিকা মাঝে মাঝে ঢাকা বিমান শুল্ক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন তাতে মনে হয় দশটি চালানের মধ্যে যদি একটিও ধরা পড়ে, প্রতি-বৎসর এ বিমান বন্দর দিয়ে কয়েকশো কোটি টাকার বেআইনী মাল আম-দানী হয় যার অধিকাংশ শেষ পর্যন্ত সীমান্ত অতিক্রম করে। ধরা পড়ার পরও চোরাচালানের যে অংশ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তাতে যে মুনাফা হয় তার প্রেক্ষিতে ধরা পড়ার অংশের লোকসান তেমন কোন ক্ষতির কারণ হয়না বলেই চোরাচালানের পরিমাণ দিন দিন এমনভাবে বেড়ে চলেছে।

ঢাকা বিমান বন্দরে শুল্ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ চোরাচালান বন্ধ করার জন্য কয়েকজন যোগ্য অফিসারের নেতৃত্বে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। মেজর (অবসর প্রাপ্ত) রৌফুল আলম নামে এক জয়েন্ট কালেক্টরের কথা শুনেছি যিনি নাকি অবৈধ আমদানীকারকদের গত কয়েক বৎসর ধরে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁকে এখান থেকে বদলি করার জন্য বহু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের জন্য হোক বা সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত অফিসার বলেই হোক তাদের চেষ্টা এখনও সফল হয়নি। অবশ্য তার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হতো না যদি না তিনি তার উপরিস্থ ও অধস্তন অফিসারের অধিকাংশের সহযোগিতা না পেতেন।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের শুল্ক অফিসারদের মধ্যে সৎ যে দু'চারজনের কথা বলেছি তাদের কথা ভাবতে গিয়ে আমার স্মৃতিতে আরও দু'চার জনের মুখ ভেসে উঠে যারা অনেকদিন পূর্বে এ বিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন কাস্টমস্ কালেক্টর নূরুল আলম চৌধুরী, আর একজন হচ্ছেন অবিভক্ত বাংলায় কোলকাতার আবগারী বিভাগের কালেক্টর গোলাম কাদের সাহেব। শুল্ক ও আবগারী বিভাগে টাকা পয়সার খেলা এত বেশী এবং আকর্ষণ এত মারাত্মক যে বিবেক ও চরিত্র নিয়ে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার নূরুল আলম চৌধুরী প্রথম বয়সে আমার সহপাঠি ও পরে বৈবাহিক সূত্রে আমার আত্মীয় হন। বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে কোন ব্যাপারে তাকে অনুরোধ করতে

www.pathagar.com

গিয়েই দেখেছি তার মুখের চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে। নীরস স্বরে বলেছে তোমার কথায় কিছু হবে না কাগজ পত্র যা বলবে সে অনুযায়ীই কাজ হবে। আত্মীয় হিসাবে আসবে—চা খাবে, অন্য গল্প করবে কিন্তু তদ্বিরের ব্যাপারে কখনও এসোনা। কোন অফিসার ঘুষখোর হলে যতদিন চাকুরীতে থাকে ততদিন হয়ত তার বিরুদ্ধে নানা কারণে লোকে বিরূপ মন্তব্য করতে ইচ্ছা করেনা কিন্তু পদ থেকে সরে গেলেই 'শালা' ছাড়া উচ্চারণ করে না। কিন্তু নূরুল আলম চৌধুরী কয়েক বৎসর আগে অবসর নিলেও তার সহকর্মীরা এবং অধস্তন অফিসারেরা এখনও অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করে। সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দিয়ে ঢাকায় আজিমপুরার গলিতে একটি ছোট দোতালা বাড়ী তৈরী করে তিনি বর্তমানে বাস করেন। ভাড়ার ও পেনসনের আয়েতে সংসার চলে যায়, আর একজন সৎ অফিসার হিসাবে তার বিভাগের পুরান অফিসারেরা এখনও তাকে সম্মান করে এই গর্বেই তার মন প্রাণ পরিতৃপ্ত।

এখন দ্বিতীয়জনের কথা বলছি। কোলকাতা শহরের মত বিরাট শহরে আবগারী বিভাগের কালেক্টর যে কি তা আজকের দিনে অনেকের পক্ষে কল্পনা করা দুষ্কর। এই পদে যিনি থাকেন তার পক্ষে অবিভক্ত বাংলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ অর্থাৎ আজকের দিনের কোটি কোটি টাকা বানান কোন কঠিন কাজই ছিল না। কিন্তু গোলাম কাদের সাহেবকে দেখেছি এত গুরুত্বপূর্ণ পদে সুদীর্ঘ পনর বৎসর থেকেও এক পয়সা কোন লাইসেন্সীর কাছ থেকে নেননি? ১৯৪৫ সনে যখন আমি একটি বারের লাইসেন্সের জন্য তাঁর কাছে যাই তিনি আমাকে বললেন মুসলমান শিক্ষিত ছেলেরা ত ব্যবসায় আসে না—তাঁরা শুধু চাকুরী খোঁজে। আপনি এ ব্যবসা করবেন? আমি সম্মতি জানালে তিনি পার্কষ্ট্রীটে অলিম্পিয়া রেষ্টুরেন্টের উপর আমাকে একটি বারের লাইসেন্স দিয়ে দিলেন। এই লাইসেন্সের জন্য কোলকাতার বহু বড় বড় ধনী প্রভাবশালী হিন্দু ও মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা প্রার্থী ছিল এবং তারা প্রয়োজন হলে এর জন্য তখনকার দিনে লক্ষ টাকাও খরচ করতে রাজি ছিল। কিন্তু গোলাম কাদের অত্যন্ত সাধু অফিসার বলে এই মহামূল্য লাইসেন্স আমাকে বিনা পয়সায় দিয়ে দিলেন। পরে অবশ্য উপরিস্থ একসাইজ কমিশনার মিঃ হস্‌কিন্স মোটা টাকা খেয়ে তাঁর উপর যথেষ্ঠ চাপ প্রয়োগ করে তার সিদ্ধান্ত উল্টিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লাইসেন্সটি দেওয়ার আইনগত ক্ষমতা

www.pathagar.com

কাদের সাহেবের ছিল বলে মিঃ হস্‌কিন্স বহু চাপ প্রয়োগ করেও কাদের সাহেবকে শেষ পর্যন্ত টলাতে পারেননি। এই লাইসেন্স পাওয়ার ফলে দেশ বিভাগের পূর্বেই আমার খানিকটা আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠে যেটি পরবর্তী-কালে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আমাকে অনেকটা সাহায্য করে।

তিনি যখন ঐ পদে প্রথম বহাল হয়ে আসেন শুনেছি চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বড়দিন উপলক্ষে গ্র্যাণ্ড হোটেল ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কর্তৃপক্ষ তার জন্য বহু মূল্যবান ভেট বা উপহার পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় হোটেলের মালিকদের তিনি অবাক করে দিয়ে ভেট শুধু ফেরৎই পাঠালেন না, সঙ্গে সঙ্গে বলেও পাঠালেন ভবিষ্যতে এসব পাঠালে তাদের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে আসেননি। তার বাড়ী ছিল হাওড়া জেলায়, তাই তিনি পশ্চিম বঙ্গেই রয়ে গেলেন। আকণ্ঠ লোভ লালসার মাঝখানে থেকেও তিনি যে ভাবে নিজেকে রক্ষা করে গেছেন ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

ঢাকার আবগারী শুল্ক বিভাগে কিছুদিন পূর্বে আমি আর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম যেটা আমাকে রীতিমত চমকে দিয়েছিল। একটা বন্ডেড অয়ার হাউসের লাইসেন্সের জন্য এক তরুণ কালেক-টরের সঙ্গে দেখা করি। আমার বক্তব্য শোনার পর যখন তাকে একটু তাড়াতাড়ি লাইসেন্সটি ইস্যু করতে অনুরোধ জানালাম তিনি খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন: দেখুন আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে লাভ নেই— আপনার ফাইল স্বাভাবিক নিয়মে ১৫ দিনেও আমার টেবিলে আসবে না। দেশে এখন কাজ কারবার যে নিয়মে চলছে সে মত কাজ করুন নচেৎ আমি তাগাদা দিলেও বিশেষ সুবিধা হবে না। ডিলিং ক্লার্ক এর পকেটে গোটা কয়েক টাকা ফেলে দিয়ে যান দেখবেন ফাইল উড়ে আমার টেবিলে চলে আসছে। শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, একজন কালেকটর কি করে এমন কথা বলতে পারে? ভাবলাম লোকটি নিশ্চয়ই নিজে একটু অসাধু প্রকৃতির তাই তার অফিসের লোকেরাও যাতে কিছু পায় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। অবশ্য আমার লোক দেশের বর্তমান দস্তুর অনুযায়ী সে ব্যবস্থা আগে করেই রেখেছিল। তাই আমি কালেকটরের কামরা থেকে বের হওয়ার পরক্ষণেই ডিলিং ক্লার্ক ফাইল নিয়ে অফিসারের কাম-রায় ঢুকল এবং পর দিনই লাইসেন্স আমরা পেয়ে গেলাম। আমার এ অভিজ্ঞতার কথা আমার পরিচিত শুল্ক বিভাগের অন্যান্য দু'চার জন

www.pathagar.com

অফিসারকে বলে উক্ত অফিসারের ব্যাপারে গোপন ইঙ্গিত করতেই তারা বলল না-না এই অফিসারটি সত্যিই অত্যন্ত সৎ ও সাধু প্রকৃতির। নিজে অত্যন্ত সৎ বলেই দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে স্বীকার করে আপনাকে হয়রানি থেকে বাঁচাবার জন্য ঐ বাস্তব কথাটা বলতে তার বাধেনি। পরে আমার বন্ধু নূরুল আলম চৌধুরী যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাকে যখন ঐ অফিসারটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম সেও বলল সত্যিই এ লোকটি অতি সৎ এবং সাধু প্রকৃতির এবং তাই এরকম বাস্তব ও সত্য কথা নির্ভিকভাবে উচ্চারণ করার মত সাহস তার রয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি অফিসারদের যারা সৎ ও সাধু তারাই শুধু সাধু ও ভাল অফিসারদের স্বীকৃতি দেন। যারা নিজেরা খারাপ তারা সাধু অফিসারদের ব্যাপারে মতামত প্রকাশের সময় এমনভাবে ইঙ্গিত করে যাতে মনে হয় তিনি ছাড়া সে বিভাগে আর ভাল লোক দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। এটা মানুষের সাধারণ ক্ষুদ্রতাবোধ থেকেই আসে। বুদ্ধিজীবীদের বেলায়ও দেখেছি তারা সাধারণতঃ সহজে একজন আর এক জনকে স্বীকৃতি দিতে চায়না কারণ প্রতিভার দিক থেকে প্রায় সবাই সমস্তরের বলে, একজন অন্য জনকে ছোট প্রমাণ করতে না পারলে নিজেকে যেন বড় করে দেখাতে পারেনা। অন্যকে ক্ষুদ্র প্রমাণের ভিতর দিয়েই যেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করবার একটা সুযোগ পায়। তাই সাধারণ লেখক, কবিদের অনেকের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দারুণ রকম উন্নাসিক মনোভাব দেখেছি। কোন সাহিত্যিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলে ও কিসের সাহিত্যিক ? কিছু লিখতে পারলেই সাহিত্য হয় না ? লেখা আর সাহিত্য এক নয়। কোন কবি সম্বন্ধে আর এক কবিকে জিজ্ঞেস করলে বলে ও কিসের কবি ? ওতো পদ্য লিখে, পদ্য আর কবিতা আলাদা জিনিষ। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে এ মনোভাবের প্রকাশ দেখেছি। একজন আর একজন সম্বন্ধে বলে ও কিসের শিল্পী ? ওর তো সুর বা তাল জ্ঞানই ঠিকমত নেই।

কিন্তু সত্যিকার বড় কবি বড় শিল্পীদের মধ্যে দেখেছি একজন নূতন কবি যত অপরিচিতই হোক না কেন, একজন নূতন বাজিয়ে যত সাধারণই হোকনা কেন তাদের অকুন্ঠ স্বীকৃতি দিতে তাঁদের বাঁধেনা কারণ তাঁরা নিজেরা এত বড় যে আশে পাশের কাউকে ছোট প্রমাণ করার তারা প্রয়োজনই বোধ করে না। তাই যে কোন নূতন কবি তার কবিতার বই

www.pathagar.com

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বা কাজী নজরুল ইসলামকে পাঠালে তারা কবিতা গুলির প্রশংসা করে লিখে পাঠাতেন কবিতাগুলি ভাল লেগেছে। লিখে যাও ভবিষ্যতে আরও ভাল হবে। এগুলো কবিতা হয়নি, একথা তাঁরা কখনও বলতেন না। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকেও দেখেছি কোন নূতন বাজিয়ে যখন খুব আগ্রহ করে তাকে বাজনা শুনাতে আসত সে বাজনার মান যত সাধারণই হোক না কেন খাঁ সাহেব বাজনা শুনে বাদককে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন : চমৎকার বাজিয়েছ ভাই, অনেকদিন এমন বাজনা শুনিনি। নূতন বাদকের বাজনার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে খাঁ সাহেব নূতন বাজিয়েদের এভাবে উৎসাহিত করতেন।

তাই বলছিলাম যারা সত্যি সন্দেহাতীতভাবে সৎ তারা নিজ বিভাগের অন্য আর একজন সাধু অফিসারের নাম উল্লেখ করে প্রশংসা করতে দ্বিধা করেনা বরং ঐ অফিসার তার সহকর্মী ছিল বলে গৌরব বোধ করে। শুল্ক ও আবগারী বিভাগে আমি এমনি আরো তিন জন অফিসারের কথা শুনেছি উক্ত বিভাগের অন্য অফিসাররা যাদের নাম অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করে। তাঁদের একজন হলেন এম. এ. কাইয়ুম যিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মেম্বার হিসাবে বর্তমনে চাকুরীতে আছেন। শুনেছি দুপুরে খাওয়ার জন্য ব্রীফ কেসে করে বাসা থেকে তিনি দুটো আটার রুটি কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়ে এসে চা দিয়ে খান। সীমিত আয়ে তাকে চলতে হয় বলে বাইরে থেকে দামী লাঞ্চ আনিয়ে খাবার ক্ষমতা তার নেই এটা স্পষ্ট বুঝা যায়।

আর একজন হলেন শাহ্ এ হান্নান। ইনিও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে শুল্ক ও আবগারী বিভাগের মেম্বার হিসাবে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে চাকুরী করার পর বর্তমানে দুর্নীতি দমন বিভাগের ডাইরেকটর জেনারেল পদে চাকুরীতে আছেন। পূর্বে এই পদে পুলিশের আই. জি. কিম্বা সি. এস পি দের কাউকে ছাড়া অন্যকে নিয়োগ কর হতো না। চাকুরী জীবনে সততার পুরস্কার হিসাবেই হান্নান সাহেবকে এই পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় আর একজন হলেন এই বিভাগের তোবারক আলী সাহেব। ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়।

www.pathagar.com

কয়েক বৎসর পূর্বে তার সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার প্রথম আলাপ তেমন হৃদ্যতা পূর্ণ ত হয়ইনি বরং খানিকটা তিক্তই হয়েছিল। লোকটি জন্মগত ভাবে একটু কড়া মেজাজের মনে হয়। পরে অবশ্য যত অনুষ্ঠানেই দেখা হয়েছে খুব ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি। ইনিও তাঁর বিভাগে অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক অফিসার বলে পরিচিত। ভদ্রলোকের চেহারাতেই আভিজাত্য ও পবিত্র জীবন যাপনের ঔজ্জ্বল্য খানিকটা পরিদৃষ্ট হয় বলে মনে হয়।

চট্টগ্রাম কাস্টমস্-এ বহুদিন যাতায়াত করে আমার যে ধারণাটা হয়েছে সেটা হলো শুল্ক অফিসারেরা আমদানীকারকদের যে ভাবে বিপদ-গ্রস্ত করে তাদের দাবী মানতে বাধ্য করে সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের রাজস্ব বিভাগও আমদানী রপ্তানী নীতি নির্ধারণকারিদের ভুল নীতির ফলে। শিল্প ও রাজস্ব বিভাগের অফিসারদের বহুবার বলেছি কোন আম-দানীকারক খোলা বাজার থেকে ডলার পাউন্ড কিনে আর্নার্স স্কীমে যখন মেশিন আমদানী করে তখন কোন কালেই ওভার-ইনভয়েসিং করে তার লাভ হয়না। শুধু যখন ক্যাশ লাইসেন্স অর্থাৎ অফিসিয়েল রেটে পাউন্ড ডলার পায় তখনই মাত্র ওভার-ইনভয়েসিং করে কিছু বেশী টাকা বিদেশে পাঠিয়ে সেটা আবার হুণ্ডী করে ফিরিয়ে আনলে বর্ধিত টাকার উপর কিছুটা প্রিমিয়াম পাওয়ার সুযোগ থাকে বলে ওভার-ইনভয়েসিং এর খানিকটা সম্ভা-বনা থাকতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষকে বার বার বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে পুরাতন ও রিকণ্ডিশনড্ মেশিনে কোন পার্থক্য রাখবেন না কারণ ঐ ফাঁক-টুকুর ভিতর দিয়ে কাস্টমস্ এর লোকদের টাকা খাওয়ার সুযোগ হয়ে যায়। কিন্তু শিল্প ও রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বরাবর যুক্তি দেখায় পুরাতন মেশিন আনবার সুযোগ দিলে আমদানীকারক বা ব্যবহারকারীরা কেউ কেউ পুরান লক্কর মেশিন এনে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করবে। তাদেরকে হাজারবার বুঝাতে চেষ্টা করেছি কোন ব্যবহারকারী তার নিজের পকেটের টাকা-সেটা বাংলাদেশী টাকাই হোক বা যাই হোক খরচ করে লক্কড় মেশিন এনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া কোন দিনই লাভবান হবে না। একমাত্র উন্মাদ ছাড়া এরূপ কেউ করতে পারে না। শুধু ক্যাশ লোনের টাকার ব্যাপারে এ ভয় থাকতে পারে। যেখানে কোটি কোটি টাকা দিয়ে পুরাতন জাহাজ, পাট ও সুতা কলের জন্য পুরান মেশিন আনতে অনুমতি দেওয়া হয় সেখানে কয়েক লক্ষ টাকার প্রিন্টিং বা অন্য মেশিন আনতে

www.pathagar.com

মিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, এটা মাথামোটা কর্তৃপক্ষকে অনেক চেষ্টা করেও বুঝাতে পারিনি। ফলে সঠিক জিনিষ এনেও শুল্ক বিভাগের লোকের কাছে আমরা দায়ের তলায় মাছ হয়ে আছি।

শুল্ক বিভাগটি রাজস্ব বিভাগের অধীন। রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারদের আমাদের এ দুর্গতির কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছি ইনভয়েসে উল্লেখিত বিবরণ সত্য এবং লাইসেন্সে বর্ণিত মালই আনা হয়েছে এ সম্পর্কে শিল্প বিভাগ বা আমদানী রপ্তানী বিভাগ যারা লাইসেন্স দেওয়ার মালিক তাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়া হলে তা যেন শুল্ক বিভাগ মেনে নেয়। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের মতামত হলো যে পয়সা খরচ করলেই শিল্প, বাণিজ্য বিভাগ বা আমদানী রপ্তানী বিভাগ থেকে ঐ রকম সার্টি-ফিকেট সহজেই পাওয়া যায়, যেন শুল্ক বিভাগের লোকেরাই একমাত্র ধর্ম-যুধিষ্ঠির, সেখানে কোন দুর্নীতি নেই। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হলো টাকা খরচ করলে শুল্ক বিভাগের সহযোগিতায় সূচের বদলে জাহাজ নিয়ে আসা যায়, ইন্দুরের বদলে হাতি নিয়ে আসা সম্ভব। চট্টগ্রামে ব্যবসায়ী মহলে খবর নিলেই জানা যায় শুল্ক বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজোস করে কত ইম্পোর্টার কোটি কোটি টাকার বে-আইনী বা নিষিদ্ধ মাল আম-দানী করে দু'চার বছরের মধ্যে কোটিপতি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ হওয়ার পর পরই শুনেছি চট্টগ্রামের এক গরুর গাড়ীর মালিক কিভাবে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেছে। প্রক্রিয়াটা ছিল এরূপ। জন্মনিয়ন্ত্রণের কনট্রাসেপ-টিভ আইটেমগুলো ডিউটি ফ্রি আইটেম, এখনও বোধ হয় তাই আছে। চট্টগ্রামের এক গরুগাড়ীর মালিকের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি এলো। সে কয়েক হাজার টাকার কনট্রাসেপটিভের এল, সি খুলে সিঙ্গাপুর থেকে কয়েক বাক্সে জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্য আনিয়ে বাকিগুলোতে বিদেশী কসমেটিক আনিয়ে নিল। যে বাক্সগুলিতে কসমেটিক ছিল সেগুলির নম্বর আলাদ এবং যেগুলিতে আসল মাল ছিল সেগুলির নম্বর আলাদা, এখন সাপ্লাইয়ার আমদানীকারককে বিশেষ বিশেষ নম্বরগুলি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়ায় আমদানীকারকের ইঙ্গিত ও নির্দেশ মত শুল্ক বিভাগের অফিসার শুধু যে যে বাক্সে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাল আছে তার মধ্যে কয়েকটি খুলে পরীক্ষা করে সব বাক্সই ঠিক আছে সার্টিফাই করে রিলিজ দিয়ে দিল। শুল্ক বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী সব বাক্স খুলতে হয় না। অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক যেখান সেখান থেকে তার পছন্দ মাফিক দুচারিটি বাক্স খুলে পরীক্ষা

www.pathagar.com

করলেই চলে। এভাবে বেশ কিছু পরিমাণ নিষিদ্ধ কসমেটিকের আমদানী থেকে পরুগাড়ীর মালিক রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেয়। এভাবে দু'চারটি কনসাইনমেন্ট আনবার পরই সে কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল। এ খবর চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী মহলে অনেকেই জানে।

পুরান কাপড় বা কাটপীস আমদানীকারকদের অনেকেই এভাবে বাংলাদেশ হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। কয়েকটি বেইলে পুরাতন কাপড় বা কাটপীস আমদানী করে বাকী গুলোতে নতুন থান কাপড় আমদানী করে এনে এমনি ভাবে শুল্ক বিভাগের কর্তা-দের সহযোগিতায় নূতন থান কাপড় রিলিজ করে নিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে। যে যে বেইলে আমদানী যোগ্য মাল রয়েছে নম্বর দেখে শুল্ক বিভাগের কর্তারা শুধু সেগুলিই পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে, অন্যগুলির ধারে কাছেও যায়নি। শুল্ক শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগে সরকার বহু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন প্রকারান্তরে যার উদ্দেশ্য হলো মুষ্টিমেয় লোক যাতে দেশের সব সম্পদ কুক্ষিগত করতে না পারে, দেশ ও সরকারকে শুল্ক, আয়কর ও অন্যান্য ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে অসৎ লোকেরা যেন অন্যায়ভাবে বিপুল ধন সম্পদের মালিক হতে না পারে। সরকার নিশ্চয়ই এটাও চান যেন অন্যায়ভাবে উপার্জ-নের পথ বন্ধ হোক ও ঐ ভাবে উপার্জনকারী যথাযোগ্য শাস্তি পেয়ে নিষিদ্ধ উপার্জনের প্রবণতা বন্ধ হোক কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সরকার যত আইনই করুক না কেন ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তার কারণ সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা আজ এমনই দাঁড়িয়েছে যে অন্যায়ের জন্য জেল, ফাটক যাই হোকনা কেন লোক তাতে আর ভয় পায় না। কারণ পয়সা খরচ করলে আজকাল জেলে রাজার হালে থাকা যায়। বৎসর সাত আটেক পূর্বের খবর জানি রেট ছিল পঞ্চাশ হাজার, বর্তমানে সেটা বেড়ে বোধ হয় লাখ খানেকে দাঁড়িয়েছে। এ টাকাটা জেলে খরচ করলেই রাজার হালে থাকা চলে। প্রতি সন্ধ্যায় হোয়াইট লেবেল হুইস্কি ও ৫৫৫ নং সিগারেটের প্যাকেট পেতে কোন অসুবিধা হয় না। তারপর দুই তিন বৎসর পর জেল থেকে বের হয়ে এসে চোরা কারবারের টাকাই হোক ঘুষের টাকাই হোক বা ব্যাঙ্কের মেরে দেওয়া টাকাই হোক বাকী টাকার একটা অংশ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং পাড়ার ক্লাবগুলিতে খরচ

www.pathagar.com

করলেই লুপ্ত সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে কোন অসুবিধাই হয় না। তাই অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কোন রকমেই জেল আজকাল প্রতিবন্ধক বা deterrent নয়।

আজকাল টাকার বিনিময়ে জেল খাটবার লোকও পাওয়া যায় শুনছি। তাই অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থের একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করে ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে জেল খাটিয়ে নিয়ে স্বগৃহে অবাধে থাকতে পারে। শুধু অসুবিধা এটুকু যে জেলের মেয়াদ পর্যন্ত ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না। পাড়ার বা এলাকার সবাই জানে তিনি জেল খাটছেন, শুধু বাসার লোকজন বা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে এক আধজন জানে যে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি জেলে নয় বাসায় আছে। আজকাল টাকা দিয়ে সব কিছু করা যায় বলে আইনের ফাঁকে প্রচুর দুর্নীতিও বেড়েছে, ফলে দেশের অনাচার বন্ধ হোক সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা এ ব্যাপারে যদি থেকেও থাকে কোন ফল হয় না। এর একমাত্র কার্যকরি সমাধানের উপায় হলো লুটের জন্য ঘৃণিত ও মারাত্মক রকমের চোরাকারবারের শাস্তির জন্য জেল না দিয়ে সোজা ফাঁসি দেওয়া। অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ ভোগ করার জন্য অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখলে চলবে না। কেউ যদি বোঝে যে ধরা পড়লে লুটপাট বা অন্যায় ভাবে উপার্জিত অর্থ ভোগ করবার জন্য সে বেঁচে থাকবে না তবে ছেলে-মেয়ে ভোগ করবে এ আশার বশবর্তী হয়ে কেউ অন্যায়ভাবে উপার্জন করতে চাইবে না। অর্থাৎ অসৎভাবে উপার্জনের অর্থ খরচ করার সুযোগ না দেওয়াটাই হলো অসৎভাবে উপার্জনের প্রবণতা বন্ধ করা।

অসৎভাবে উপার্জনের প্রবণতা বন্ধ করার আর একটি উপায় হলো ব্যক্তিগত সম্পদকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসা। সীমাহীন ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের সুযোগ থাকলেই ন্যায়-অন্যায় যে ভাবে হোক এ সম্পদ করায়ত্ব করার জন্য মানুষের একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা জাগে। একটা বাড়ীই একটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দেখা যায় শহরে যাদের আয় সীমাহীন তারা একটার পর একটা বাড়ী করেই চলেছে। একটা পরিবারের জন্য ৫ কাটা জমিই যথেষ্ট, কিন্তু দেখা গেছে সম্পত্তির পরিমাণ সীমাবদ্ধতার অভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম বড় বড় শহরগুলোতে যাদের হাতে প্রচুর পয়সা জমেছে তারা বিঘার পর বিঘা জমি কিনেই চলেছে, তাতে ক্রমাগত জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে। ফলে যাদের মাথা গোঁজার জন্য সত্যিকারভাবে ছোট

www.pathagar.com

এক টুকরা জমির দরকার তারা জমি কিনতে পারছে না। তাই অন্যায় ভাবে অবারিত সম্পদ করায়ত্ব করার প্রবণতা বন্ধ করার জন্য শহর বন্দরে ব্যক্তিগত জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এসব কথা নানাভাবে লেখার মারফৎ, সভা সমিতিতে আলোচনার মারফৎ শাসক কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছি এবং দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কঠোর ও কার্য্যকরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, দুঃখের বিষয় কোন কাজ হয়নি। পরে বুঝেছি আমি যে শর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াতে চেষ্টা করছি সে শর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। সমস্যার গোড়া ধরে টান দিতে কারও সাহসও নেই, হয়তো ইচ্ছাও নেই। বাইরে তারা শুধু মিথ্যা আশ্বাস ও কথার ফুলঝুরি উড়াচ্ছে। দুর্নীতি ও অসৎ উপার্জন বন্ধ করার উপযুক্ত পদক্ষেপের পরিবর্তে এখানে ওখানে দুচার জন চুনোপুটিকে শাস্তি দিয়ে দেশের মানুষগুলোকে ক্রমাগত হতাশার দিকে ঠেলে দেওয়ার মারফৎ দেশের সার্বজনীন মৃত্যু ঘটাতে সাহায্য করেছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি দেশের ভবিষ্যতের জন্য কি ভয়াবহ ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে আজ যে অরাজকতা ও দুর্নীতি চলছে বৎসরাধিককাল আগে সামরিক বাহিনীর খুবই উচ্চপদস্থ একজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। কিভাবে কার্য্যকরিভাবে চোরা কারবার বন্ধ করা যায় তার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁকে বলছিলাম। তাঁকে বলছিলাম আমাদের দেশে গত কয়েক বৎসর কিছু নব্য ধনকুবের সৃষ্টি হয়েছে যারা ইচ্ছেমত টাকার বলে যে কোন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রায় পুরাপুরিটা গুদামজাত করে একটা কৃত্রিম অভাব সাময়িকভাবে সৃষ্টির মারফত মোটা মুনাফা লুটে নেয়। মন্ত্রী মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন এটা বন্ধ করার উপায় কি? আমি বললাম, ধরুণ যেমন কাগজের ব্যাপার। নয়াবাজার হলো সব রকমের কাগজের হোলসেল মার্কেট। মাঝে মাঝে দেখবেন সাদা কাগজের দারুণ অনটণ। সারা বাজার খুঁজেও আপনি একশত রিম হোয়াইটপ্রিন্ট ডবল ক্রাউন বা ডবল ডিমাই কাগজ পাবেন না। বড় বড় ডিলার ও ষ্টকিষ্টরা কর্ণফুলী কাগজের মিলের কর্তাদের কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই খবর পায় কখন মেশিন বাৎসরিক ওভারহলিং এর জন্য বা কাঁচা মালের অভাবে কোন ধরনের কাগজের উৎপাদন বন্ধ থাকবে। সে খবর অনুযায়ী তারা সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব কাগজ গুদামজাত করে ফেলবে। সারা বাজার ঘুরেও আপনি ন্যায্য-মূল্যে দশ রিম কাগজ যোগাড় করতে পারবেন না, কিন্তু বাজারে দালালেরা ঘুরা-

www.pathagar.com

ফিরা করছে। তাদেরকে ধরলেই আপনি যদি মিল রেটের চাইতে ১০০/-১৫০ টাকা বেশী দিতে রাজী হন-তবে যত ইচ্ছা কাগজ পেয়ে যাবেন। তারা বলবে আপনি অপেক্ষা করুন আমরা খুঁজে কাগজ যোগাড় করে দিচ্ছি। একথা বলেই তাদের একজন নয়াবাজারের কোন এক গলির পথে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আধ-ঘন্টা পরেই দেখবেন ঠেলাগাড়ীতে করে কাগজ চলে এসেছে। ব্যাপার হলো গুদামজাতকারীরা দোকানে দু'এক রিম কাগজ রাখে হয়তো রাখেইনা, বলে মিল থেকে সাপ্লাই নাই তাই বাজারে কাগজের দারুণ অভাব। সব কাগজ তারা বাজার থেকে দূরে বিভিন্ন গুদামে স্টক করে রাখে এবং উপযুক্ত খরিদ্দার পেলে দালালের মারফৎ ডেলিভারী দেয়।

এখন এদেরকে খুঁজে বের করতে হলে গভর্ণমেন্টের এন্টিকরাপসন বা বিশেষ স্কোয়াড নয়াবাজারের দোকানগুলির উপর ছদ্মবেশে নজর রাখবে এবং সাধারণ খরিদ্দার হিসাবে দালালদের সঙ্গে আলাপ করে শ'দুশ রিম কেনার জন্য প্রস্তাব দিয়ে দাম ঠিক করার পর দালালটিকে তার অজ্ঞাতে অনুসরণ করে গুদামের ঠিকানা বের করে নেবে। কোন দ্রব্যের এরূপ আকস্মিক অভাবের লক্ষণ দেখা দিলেই সরকার পক্ষ থেকে আদেশ জারি করে ঐ মাল কার কাছে কত স্টক আছে, তার গুদামের অবস্থান কোথায় এবং প্রতিদিন গুদামে রক্ষিত মালের পরিমাণ কত এটা প্রত্যেক ডিলারকে ঘোষণা করবার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশ দিতে হবে। পত্রিকা মারফৎ সরকারী নির্দেশ হিসাবে এটাও কঠোরভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে ধরা পড়লে শুধু স্টকিস্ট নয় গুদাম ঘরটির মালিক যিনি তাকেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

পূর্বেই বলেছি লুকিয়ে গুদামজাত করা মাল বিক্রি দোকানদারেরা করে সাধারণতঃ দালালের মারফৎ। সাধারণ লোকের ন্যায় ছদ্মবেশী পুলিশের লোকেরা শুধু দালালদের মুভমেন্ট আর কাগজের বাজারে ঠেলাগাড়ীগুলির উপর নজর রাখলেই লুকিয়ে রাখা কাগজের গুদাম গুলির হদিস পেয়ে যাবে। এরূপ গুদাম বের করে গুদামে রক্ষিত মালের ডিক্লারেশনের পরিমাণের চাইতে বেশী মাল অথবা ডিক্লারেশন না দেওয়া গুদামে মাল পেলেই মালিক এবং গুদামের মালিক উভয়কেই ধরে মাল বাজায়াপ্ত ছাড়াও আদর্শমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব পুলিশ অফিসারকে একাজে নিয়োজিত করা হবে তারা যেন অত্যন্ত সৎ হয়। দশ বিশ বা

www.pathagar.com

লাখ খানেক টাকায় আত্মবিক্রি করতে সম্মত না হয় এমন লোককে দিয়ে স্কোয়াড তৈরী করতে হবে। অধুনা দেশের মানুষের চরিত্রের বিশেষ করে পুলিশের নিচের দিকে এখন যে মানসিকতা বিরাজ করছে তাতে এরূপ লোক পাওয়া দুষ্কর হবে। গুদামের অবস্থান জানতে পেরেছে বা তল্লাশিতে যে অফিসার বা সিপাই গেছে তাকে হাত করার জন্য প্রয়োজনে দু'চার পাঁচ লাখও এসব চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা খরচ করতে দ্বিধা করবেনা। এরূপ মোটা টাকার লোভ সামলাতে পারে এমন অফিসার দিয়েই এসব কাজ করাতে হবে। এরূপ লোক যোগাড় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনার জানা মতে যদি হাজার হাজার সিপাই ও শত শত অফিসার থাকে তাদের মধ্যে একজনকে যদি আপনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন যে টাকা দিয়ে তাকে কেনা যাবে না তবে তাকে তার জানা মতে এমন শক্ত ইমানের আর পাঁচজনকে খুঁজে বের করতে বলবেন। পুলিশের লোকই সঠিক ভাবে জানে তার ডিপার্টমেন্টে এরূপ ঈমানদার লোক কে আছে। এরূপ পাঁচ জনকে পাওয়া গেলে তাদেরকে বলা হবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে প্রত্যেকে আরও পাঁচজন খুঁজে নিতে। এভাবে শ'খানেক, নিদেন পক্ষে পঞ্চাশজন লোক যোগাড় করা দেশে সৎলোকের যত ক্রাইসিসই থাকুক, অসম্ভব ব্যাপার হবে না। এরূপ সৎলোক পুলিশ বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগ থেকেও নেওয়া যেতে পারে তবে তাদের এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিতে হবে। কিন্তু সরকারের পরিকল্পনা থানার সাহায্য নিয়ে যেভাবে গতানুগতিক ভাবে কার্য্যকরি করা হয় তাতে এ ধরনের পুলিশী তৎপরতায় কোন কাজ হবেনা কারণ দশ বিশ হাজার, প্রয়োজনে দু'চার লাখ টাকার চাঁদির জুতা মারলেই সবই ঠিক হয়ে যাবে। কোন মালই পাওয়া যাবে না।

মন্ত্রী সাহেবকে যখন আমি আমার এ পরিকল্পনার কথা বলছিলাম তিনি চোখ বড় বড় করে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে দু'একটি প্রশ্ন করে পরিকল্পনার খুটিনাটিগুলি পরিষ্কার করে নিচ্ছিলেন। আমার মনে হলো চোরাকারবার অনেকটা কার্য্যকরি ভাবে যে এতে বন্ধ করা যায় এটাতে তার অনেকটা প্রতীতি জন্মেছে এবং সুযোগ পেলে এই প্রক্রিয়াটা যে কোন আইটেমের ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখবেন। আমি তাঁকে বললাম চোরা কারবার কোন দেশে কোন সরকারই সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেনি। তবে ষোল আনার জায়গায় দশ বার আনাও যদি বন্ধ করতে পারেন তবুও জন জীবনে একটি বিরাট স্বস্তি আসবে, লোকে হাত তুলে

www.pathagar.com

আপনাদের দোয়া করবে।

কিন্তু হালে চিনির ব্যাপারে যা ঘটল অল্প কয়েকটি লোক চিনির কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে গুদামজাতের মারফত যেভাবে দেশের সমস্ত লোককে জিম্মি করে কয়েকশ কোটি টাকা বের করে নিল তাতে বুঝলাম উপরোক্ত অতি উচ্চ পদস্থ মন্ত্রীটি আমার পরিকল্পনার কথা কাজের চাপে হয় তো ভুলেই গেছেন নতুবা এটা কার্য্যকরি করা তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। বৎসর পাঁচেক পূর্বে একবার সতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গেও আলাপ করে তাঁকে আমার এ পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে আমাকে প্রতিজ্ঞা করলেন দিন পনর পরে এর খুটিনাটি ও বাস্তব প্রয়োগের কৌশল নিয়ে আমার সঙ্গে আবার আলাপে বসবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাকে আর তিনি ডাকেননি। দেশের এবং সর্ব বিভাগের মানুষের চরিত্রের অধঃপতন তখন এমন পর্যায়ে আসেনি। এখনকার চাইতে অনেক সহজেই এরূপ কাজের জন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন সৎ ও নিষ্ঠাবান দু'চার শত কর্মচারী পাওয়া যেত যেটা এখন পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার হবে। আমার উপরোক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক শুধু কাগজ নয়, সর্ব রকমের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের গুপ্ত ষ্টক খুঁজে বের করা সম্ভব। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করছি। এরূপ চোরাকারবারীদের ধরতে পারলে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শাস্তি দিয়ে অর্থাৎ সাধারণ পদ্ধতিতে থানার মারফৎ ইনকোয়ারী করে জেল জরিমানা করে এ ধরণের চোরাকারবার কখনও বন্ধ করা যাবে না। এদের ধরা মাত্র স্পেশাল কোর্ট বিচার করে জেল, ফাঁসি, নিদেন পক্ষে উপযুক্ত স্থানে জনতার সামনে কঠিন বেত্রাঘাত এবং সে সঙ্গে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ ছাড়া এটা বন্ধ করা যাবে না। অন্যরকম ব্যবস্থায় যারা তদন্তে থাকবে তারাই শুধু শেষ পর্যন্ত লাভবান হবে। পাঁচ বৎসর পূর্বে জিয়া সাহেবকে এবং বৎসরাধিককাল পূর্বে সামরিক বিভাগের ক্ষমতাশালী মন্ত্রীটিকে আমি একথাটা স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম।

ড্রাস্টিক ষ্টেপ বা কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার মনোভাব নিলে যে কিরূপ কাজ হয় তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৩ সনের মাঝামাঝি কর্ণফুলির কাগজ নিয়ে দারুণ রকম চোরাকারবার চলছিল। স্বাধীনতার পূর্বের ৪২ টাকা রীমের কাগজ তখন ১৫০/২০০ টাকা হয়ে গেছে। মুদ্রণ শিল্প সমিতি থেকে আমরা শিল্প বিভাগের প্রতি মন্ত্রী নূরুল ইসলাম চৌধুরীকে বুঝালাম কর্ণফুলী কাগজের সত্যিকার ব্যবহারকারী

www.pathagar.com

আমরা প্রেস মালিকেরা। স্বাধীনতার পূর্বে কর্ণফুলীর ডিলার ছিল ১৫ কি ২০ জন ঠিক মনে নেই তবে তখন পশ্চিম পাকিস্তানে সাপ্লাই দিয়েও এখানে কোন কাগজের মাঝে মাঝে সামান্য ঘাটতি ছাড়া তেমন উল্লেখ-যোগ্য কোন সংকট দেখা দিতনা। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই ঢাকাস্থ মিল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ১৫/২০ জনের স্থলে আড়াইশ তিনশ ডিলার নিযুক্ত করে ফেলল। তখন আরম্ভ হল প্রকৃত খেলা। সব সময় সব রকমের কাগজের চাহিদা এক রকম থাকে না। কোনটার ডিম্যাণ্ড বাজারে বেশী কোনটার চাহিদা কম। এখন ভাল কাগজ কাকে কতটা দেওয়া হবে এই উপলক্ষেই টাকার খেলা আরম্ভ হলো। আগে ১৫/২০ জন ডিলার ছিল এখন ২৫০/৩০০ হওয়ায় অফিসারদের খুসি করার লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় তাদের পোয়াবার হলো। আগে একজন ডিলার কোন এক পদের ভাল কাগজ ৫০০ রিম পেলেও রিম প্রতি দশ টাকা মুনাফা করলে তার পাঁচ হাজার টাকা হয়ে যেত। এখন একজন ডিলার ঐ কাগজ পায় ভাগে উর্দ্ধে কুড়ি পঁচিশ রিম, তাই রিম প্রতি দেড়শ দুশ টাকা মুনাফা না করলে সঙ্গত কারণেই তার চলে না।

তখন ঢাকা অফিসে ডিলার নিযুক্তি ও কাগজ ডিস্ট্রিবিউশনের বড় কর্তা ছিলেন একজন ডক্টরেট করা ডাইরেকটর। আমি তাকে বিপুল সংখ্যক ডিলার নিযুক্তির কুফলেরর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন আমরা নূতন বাংলাদেশে কয়েকজন কোটিপতি চাই না। আয়ের সুষম বন্টনের জন্য এ ব্যবস্থা নিয়েছি, কয়েকশ লোক যাতে লাভের অংশ পায় কথাটা খুবই মুখরোচক কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে আমার দেরী হলো না। আমি প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম চৌধুরীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলাম যে মিলের উৎপাদিত কাগজের একটা মোটা অংশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির হাতে অর্পন করলে চোরা কারবার অনেকটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের এ প্রচেষ্টার মধ্যে বিভাগীয় কর্তা হিসাবে যতবারই প্রতিমন্ত্রী সাহেব ডাইরেকটর সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলেন ততবারই তিনি নানা অজুহাত তুলে আপত্তি করতে লাগলেন।

যাহোক শেষ পর্যন্ত প্রতিমন্ত্রী যখন ফাইনাল অর্ডার দিয়ে দিলেন উৎ-পাদনের একটা মোটা অংশ মুদ্রণ শিল্প সমিতিকে দিয়ে দেওয়া হোক তখন দিনের পর দিন যায় নানা ছুতায় আজ ডিলিং এসিসট্যান্ট ছুটিতে, কাল

www.pathagar.com

টাইপিস্ট আসেনি, অমুক দিন অমুক সেকশান ইনচার্জ নাই এভাবে ডাইরেক-টর সাহেব কাল হরণ করলে লাগলেন। এসব দেখে একদিন আমার ধৈর্য্য-চুতি ঘটল। তখন বেলা প্রায় ৪টা। আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে কঠোর স্বরে বললাম, দেখুন '৭১ সনে যে বিপ্লব হয়েছে সে বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি। তার দ্বিতীয় স্তর এখনও বাকী আছে। আপনি যেসব খেলা আরম্ভ করেছেন এটা শেষ পর্য্যন্ত আপনার জন্য খুবই মারাত্মক হবে। মাস ছয়েকের, বড় জোর এক বৎসরের মধ্যে দেশে আর একটা বিপ্লব হবে। আপনি তখন কোথায় থাকবেন জানিনা। তবে মনে রাখুন যদি দেশের বাইরে পালিয়ে যান সে স্বতন্ত্র কথা আর যদি বাংলাদেশে থাকেন তবে যেখানেই লুকিয়ে থাকুন না কেন আপনাকে আমি খুঁজে বের করে আনব এবং আজকের এ কার্য্যকলাপের জন্য আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

বিশ্বাস করুন আমার কথাগুলি শোনার পর তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তার মুখের চেহারা মৃতের মত সাদা হয়ে গেল। স্খলিত স্বরে বললেন না-না আমার কি দোষ, টাইপিস্ট নাই তাই অর্ডার আজ দিতে পারছি না। আমি তার মুখের চেহারা দেখেই স্থির নিশ্চিত হয়ে গেলাম এলোকই আসল কাজপ্রিট। তাই আমার সাহস আরও বেড়ে গল। আমি কঠোরে স্বরে বললাম যেখানে থেকে হোক টাইপিস্ট যোগাড় করে আনুন। এখনও ৫টা বাজেনি। 'দেখি কি করা যায়' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট দশেক পরে অন্য বিভাগ থেকে একজন টাইপিস্ট এনে ৫ কপি অর্ডার টাইপ করে যখন আমার হাতে দিলেন তখন-সন্ধ্যা ৬টা। যাহোক এর পরেই যখন দুই তিন কিস্তির মাল আমরা কর্ণফুলী মিল থেকে সোজা সুজি নিজেরা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বাজার আশাতিত ভাবে নিচে নেমে গেল এবং দুমাসের মধ্যে বাজার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আওয়ামী লীগের প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সাহেব জনপ্রতিনিধি ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল, জিয়ার বা বর্তমান আমলের মত নমিনেটেড মিনিস্টার হলে বোধ হয় সম্ভব হতো না। কিছুক্ষণপূর্বে যে সামরিক বিভাগের মন্ত্রিমহোদয়ের কথা উল্লেখ করেছি তাঁকে এ ঘটনার কথা বলে জানিয়েছি যে কেমিক্যাল কর্পোরেশন বর্তমানে ঠিক এভাবেই কাগজের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কয়েকজন অফিসার ও ডিলারদের ফায়দা লুটতে সাহায্য

www.pathagar.com

করছে। শুনে ওপেন মিটিংএ সেক্রেটারিদের সামনেই তিনি মতামত প্রকাশ করলেন প্রেসের মালিকেরাই যখন আলটিমেট কর্তৃমার তাদেরকে এবার থেকে সরাসরিভাবে কাগজ সাপ্লাই দিতে তিনি কোন অসুবিধা দেখেননা। মুদ্রণ ও প্যাকেজিং শিল্পের স্বার্থে এটা মঙ্গলজনকই হবে। মন্ত্রী সাহেবের এ মতামত প্রকাশের পর সাত আট মাস হতে চলল কিন্তু মিলের তরফ থেকে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি কিছুদিন পূর্বে উক্ত সামরিক মন্ত্রি মহোদয়কে যখন বললাম স্যার মুদ্রণ শিল্পকে কর্ণফুলি মিল থেকে কাগজ দেওয়ার যে অর্ডার আপনি মাস আটেক পূর্বে দিয়েছিলেন তা এখনও পালিত হয়নি। শুনে মন্ত্রি মহোদয় উত্তেজিত হয়ে বললেন কি আমার অর্ডার এখনও পালিত হয় নি? কালকেই আমি অফিসে গিয়ে ক্যামিকাল করপোরেশনের চেয়ারম্যানের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করব। মন্ত্রি মহোদয়ের উষ্মা দেখে আমার দুঃখ হলো—তাদের ক্ষমতার দৌড় কতটুকু আমার জানা ছিল। তাই আমি শান্তকণ্ঠে বললাম স্যার অত উত্তেজিত হয়ে লাভ কিছু হবেনা। মাঝ থেকে নিজে অপদস্থ হবেন। এই করপোরেশনের চেয়ারম্যানের খুঁটির জোর কোথায় তাও আপনার জানা আছে। বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে নিজের চাকুরীটাই হয়ত হারাবেন। কোন করপোরেশনের চেয়ারম্যানই দু'তিন বছরের বেশী কোথাও থাকেনা, আর ইনি দশএগার বছর ধরে একই পদে একই স্থানে আছেন, কারণটা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। শুনে মন্ত্রি বাহাদুরের মুখখানা চুপসে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন।

কয়েকদিন আগে মোহাম্মদ পুরে শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাসায় গিয়েছিলাম। দেশের বর্তমান অবস্থার কথা উঠতেই তিনি বললেন আমি কোন আওয়ামী লীগার ছিলামনা, শেখ সাহেবকে আমি কোন দিন পছন্দ করতাম না। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমার এখন মনে হয় শেখ সাহেব একজন ফেরেস্তা ছিলেন। ইতিমধ্যে আলাপ করে দেখেছি' ৭২ এর পরে নানা কারণে যারা শেখের উপর খড়্গহস্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রায়ই তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করতেন, বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি লক্ষণে শেখ সাহেবের সম্পর্কে তাদের মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গাড়ী করে যেতে, চান্দিনা বাইপাস, কুমিল্লা থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা সোজা করার নামে মূল্যবান কৃষিজমি নষ্ট করে অবিশ্বাস্য রেটে যে সব রাস্তা তৈরী হচ্ছে এবং

www.pathagar.com

তার ফলে দারুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে জনজীবন যেভাবে দুর্বিসহ করে তুলেছে তা দেখলে আমারও মনে হয় যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি ও দুর্বলতা প্রদর্শন স্বত্বেও শেখ মুজিব একজন ফেরেস্তাই ছিলেন।

আমার সমব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ গত কয়েক বৎসরে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাদের মত আমাকেও অত্যাধুনিক মেশিনপত্র আনতে হয়েছে, তার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হওয়ায় সোজা পথে ঐ অর্থ যোগাড় করতে না পেরে আমাকেও মাঝে মধ্যে বাঁকা পথ ধরতে হয়েছে। তাতে মন ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে কিন্তু উপায় নেই; প্রতিষ্ঠানকে যে ভাবেই হোক বাঁচাতেই হবে, বাজারে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, নিজের মনকে বুঝিয়েছি—যস্সিমন দেশে যদ্ আচরেৎ অর্থাৎ যখন যে নিয়ম দেশে প্রচলিত থাকবে তদনুযায়ী আচরণ করবে। মোটের উপর নিজের অতীত জীবনের কথা যখন ভাবি মন বিষাদে ভরে যায়। মনে হয় পারিপার্শ্বিকতা মানুষকে ধীরে ধীরে কতনা পরিবর্তিত করে ফেলে।

ক্রমাগত বিরুদ্ধে শক্তির চাপে মনের সজীব অনুভূতিগুলি কত ভোঁতা হয়ে যায়। একদিন দু'টাকার বিল কেটেছিল বলে অত বড় কোম্পানীর কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম আর আজ আট দশ হাজার টাকা কেটে দিলেও বাকী টাকাটা পকেটস্থ করে বিনা প্রতিবাদে চলে আসি। টেণ্ডার কমবার সময় ম্যানেজারকে নিজেই বলি কমিশনের অঙ্কটা আর একটু বেশী করে ধরুণ কারণ কাজটা পেতেই হবে। গত কয় বৎসরে এদেশে সর্ব ক্ষেত্রে চরিত্র ধ্বংস ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ঘটেছে তার তুলনা নেই। চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যে মানুষ ছিলাম আজ আর সে মানুষ নেই। একথাটা মনে হওয়ার কারণ কিছুদিন পূর্বে সস্ত্রীক গুলশানে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এক বিঘার ওপর সুন্দর আধুনিক ফ্যাসানের দোতালা বাড়ী। সামনে পিছনে সবুজ লন। গাড়ীর রাস্তার দুপাশে ফুলের কেয়ারী দেখে আমার স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এবার ভেবে দেখ জীবনে কত বড় ভুল করেছ। এরকম জায়গায় আজ আমাদেরও বাড়ী হতে পারত। ব্যাপারটা হলো ১৯৬২ সনে ডি,আই,টি, যখন গুলশানে প্লটের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে তখন এক কলামে লেখা ছিল দরখাস্তকারীর নিজের বা স্ত্রীর নামে ঢাকায় কোন জমি আছেকিনা তা ঘোষণা

www.pathagar.com

করতে হবে। আমিও গুলশানে এক বিঘার প্লটের জন্য দরখাস্ত করি এবং ঐ কলামে লিখে দেই যে মগবাজারে আমার স্ত্রীর নামে দশ কাঠা জমি আছে। এই ঘোষণার ফলে আমার প্লট বরাদ্দ হলোনা কিন্তু যারা "নাই" লিখল বা আছে কি নাই কিছুই উল্লেখ করলনা তাদের অধিকাংশই বরাদ্দ পেয়ে গেল। বোর্ড অব ট্রাষ্টিতে আমার একজন পরিচিতি ব্যক্তি ছিলেন মরহুম খান বাহাদুর নূরুল হক সাহেব। আমার জমি না পাওয়ার কারণ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন প্লট বরাদ্দের সময় যারা নিজের বা স্ত্রীর নামে ঢাকায় জমি আছে ঘোষণা করেছে বোর্ড তাদের প্লট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি তখন বললাম এখন কি উপায় করা যায় বলুন। একটা প্লট পাওয়ার আমার একান্ত ইচ্ছা কারণ মগ-বাজারে আমার স্ত্রীর প্লটের আশে পাশে এখন ও কোন রাস্তা ঘাট হয়নি। তিনি বললেন তা হলে নূতন করে দরখাস্ত করুন। কিন্তু ঢাকায় জমি নাই একথা লিখতে হবে। ঢাকায় আমার স্ত্রীর নামে সত্যিই দশ কাঠা জমি থাকা সত্বেও কোন জমি নাই জাজ্বল্যমান এ মিথ্যা কথা কি করে লিখব ভেবে পেলাম না। ১৯৪৯ সন থেকে আমি বরাবরই মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তাই ভয় হলো এরূপ মিথ্যা কথা লিখলে ভবিষ্যতে জানাজানি হলে অপদস্থ হতে পারি, বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল হয়ে যেতে পারে, সমাজে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবো, এসব কথা ভেবে আর দরখাস্ত করলাম না। কিন্তু আজ আমি জানি গুলশান বনানীতে যারা প্লট পেয়েছে তাদের শতকরা আশি জনেরই ঢাকায় স্বনামে বেনামে জমি ছিল কিন্তু তারা সত্য গোপন করে একাধিক প্লট পেয়ে গেছে। '৬২ সালে আমার ধারনা ছিল সত্যিই বুঝি এব্যাপারে তদন্ত হবে এবং মিথ্যা ঘোষণাকারীরা পরে বিপদে পড়বে কিন্তু পরে দেখলাম তার কিছুই হলোনা। তাই এখন আমার পরিবারের লোকেরা মনে করে সত্যের প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা দেখাতে গিয়ে আমি ইডিয়েটের মত কাজই করেছি নচেৎ গুলশানের মত জায়গায় আজ তারাও একটি সুরম্য ভবনের মালিক হতো। স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস শুনে হঠাৎ মনে হলো তার দুঃখটা যেন আমার মনেও খানিকটা সঞ্চারিত হলো। অবশ্য তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে নিজের উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাসটা তাড়াতাড়ি চেপে ফেলে স্ত্রীকে বললাম ঃ উপরের দিকে না তাকিয়ে নিচের দিকে তাকাতে শেখ, অনেকটা শান্তি পাবে। তোমার ত দশ কাঠা আছে, ঢাকায় শতকর নিরানব্বই জনেরই যা নেই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি লোভ জিনিষটা সংক্রামক ব্যাধির মত, তার হাত

www.pathagar.com

থেকে সহজে নিস্তার নেই। সে সময় আমার মনে হয়েছিল প্রথম জীবনে অত সৎ থাকার চেষ্টা না করলেও চলত। তাই আমার মনে হলো এখন আমি পূর্বের সে মানুষটি আর নেই। এখনকার মানুষটি পূর্বের মানুষটির ফসিল বা কঙ্কাল। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, বোধ হয় দেশের অধিকাংশ বিবেকবান মানুষের ক্ষেত্রেই এটা সত্য, চাই তিনি ব্যবসায়ী হোন বা চাকুরিজীবিই হোন।

চাকুরিজীবিদের কথা বললাম এই কারণে যে স্বাধীনতার পরে বেশ কিছু অফিসারকে দেখেছি ন্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে, অন্যায়কে ঠেকাতে গিয়ে কচুকাটা হয়েছেন। অবস্থা আজ এমনই দাঁড়িয়েছে যে সীমিত আয়ে পরিবার প্রতিপালন হচ্ছেনা বলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক অধিকাংশ অফিসার যখন ঘুষ নিতে আরম্ভ করেছে তখন দু'চার জন যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে লোভ লালসাকে তুচ্ছ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেষ্টা করেছে তারা শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে হয় উপরোক্ত অফিসারদের সঙ্গে হাত মিলাতে বাধ্য হয়েছে নয়ত তাদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে এখন জেলের ঘানি টেনে চলেছে অথবা বাপ বাপ করে চাকুরী ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। আমি বেলায়েত হোসেন নামে একজন ব্যাংক অফিসারকে জানি যিনি একটা মোটা রকমের জালিয়াতির কেস ধরতে গিয়ে চাকুরি হারিয়ে আজ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভদ্রলোক এক রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকে চাকুরী করতেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের এক ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজার হয়ে গিয়ে দেখলেন যে একজন ব্যবসায়ী অন্য একটি ব্যাংকের মারফত চেক দিয়ে ব্রাঞ্চ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে নিচ্ছে। তখন তার মনে হলো এ লোক নিশ্চয়ই বড় ব্যবসায়ী, চেষ্টা করলে তার কাছ থেকে মোটা রকমের ডিপোজিট নেওয়া যেতে পারে। তাই তিনি লোকটির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করে যখন তার অস্তিত্বই খুঁজে পেলেন না, তখন তার মনে সন্দেহ জন্মালো। তিনি ঢাকায় হেড অফিসে জানালেন। এটা একটা বিরাট জালিয়াতির ঘটনা প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা লোপাটের ব্যাপার। এর সঙ্গে বাইরের লোক ছাড়াও ব্যাংকের বেশ কিছু অফিসার জড়িত ছিল। তারা তখন দল বেঁধে তাকেই আসামী করে জেলে পুরবার মতলব করলো। তাদের বক্তব্য বোধ হয় এই ছিল যে রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকের টাকা হলো লা ওয়ারিশ মাল, আমরা লুটে পুটে খাচ্ছিলাম, তুই বেটা বাগড়া দেবার কে? ফলে সেটা ধরতে গিয়ে ভদ্রলোক সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জেল খাটতে

www.pathagar.com

গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিলেন। এখন ভদ্রলোককে দেখে মায়া হয়, হঠাৎ বয়স যেন কুড়ি বৎসর বেড়ে গেছে। আরও দু'চারজন ব্যাংক অফিসারকে আমি জানি যাদের অত্যন্ত সৎ বলে বাজারে বিশেষ খ্যাতি ছিল। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি কেসে তাদের সবারই জেলের হুকুম হলো। বহু চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত খালাস হলেও তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত যিনি, বাজারে যার সুনাম সব চাইতে বেশী তিনি বৎসরাধিক কাল জেল খেটে সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় যেসব ব্যাংক অফিসার ঘুষখোর বলে বেশ দুর্নাম আছে তাদের কারও কোন ক্ষতি হয়নি। তারা বেশ বহাল তবিয়তে আছেন, চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রমোশনের পর প্রমোশন পাচ্ছেন, কারণ উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজন মত তেল ঢালতে তারা সিদ্ধহস্ত।

গত দশ বার বৎসরে অধিকাংশ ব্যাংক অফিসার সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মেছে তা খুবই তিক্ত। আমাদের প্রতিষ্ঠান খুবই বড় এবং স্বাধীনতার পর শিল্প ও ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে যেমন হঠাৎ শ্রীবৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছে তেমনি প্রথমাবধি আমাদের মুদ্রার ক্রমাগত অবমূল্যায়ণে কার্যকরী মূলধনেরও অনেক বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার প্রথমাবধি একটি বিদেশী ব্যাংক আমাদের ব্যাংকার। তারা যখন আমাদের ক্রমবর্ধমান কার্যকরি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে অস্বীকার করল তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করলাম। এরা সবাই আমার পূর্ব পরিচিত। আমাদের চাহিদা ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ লাখের মত। যে অফিসারের কাছেই যেতাম খুব সমাদর করে বসিয়ে বলতেন মোহাইমেন ভাই আপনার প্রতিষ্ঠানত অতি সুপরিচিত এবং বাজারে সুনামও যথেষ্ট আছে। ক্লায়েন্ট হিসাবে আপনারা প্রথম শ্রেণীর, তাই আপনাদের টাকা দিতে কোন ভয়ই নেই। তবে অসুবিধা কি জানেন? জুটমিল ও কটনমিল কর্পোরেশনগুলি আমাদের সব টাকা গিলে বসে আছে। এগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং আমরাও সরকারী ব্যাংক টাকা না দিয়ে পারিনা। যাহোক আপনি এসেছেন, পার্টি হিসাবে আপনি খুবই ভাল। একটা কিছু আপনার জন্যে করতেই হবে। এখনো নভেম্বর মাস, আপনি ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে একবার আসবেন। তখন কয়েক কোটি টাকা আমাদের বিভিন্ন সেক্টর থেকে উসুল হওয়ার কথা। তখন পঞ্চাশ ষাট লাখ আপনাকে

www.pathagar.com

দিতে পারব। এর পর যখন মার্চে দেখা করছি তখন বলল ভাই টাকাটা এসেছিল কিন্তু গভর্ণমেন্ট স্পেশাল অর্ডার দিয়ে অমুক সেক্টরে টাকাটা লোন দিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। আগামী সেপ্টেম্বরে আপনি আসবেন, তখন বেশ কিছু টাকা আমাদের হাতে আসবে।

এভাবে গত দশ বার বৎসর ধরে অধিকাংশ রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছি আর মার্চ সেপ্টেম্বরের জিকির শুনেছি, টাকা কোথা থেকেও পাইনি। কিন্তু আমাদের চাইতে অনেক কম পরিচিত এবং আমাদের অনেক পরে যারা শিল্পক্ষেত্রে এসেছে এরূপ বহু প্রতিষ্ঠানই এসমস্ত ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে যার অনেক টাকাই এখন উসুল হচ্ছেনা। এতদিনে বুঝতে পেরেছি আমার টাকা না পাওয়ার কারণ কি। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে ঋণ দানের ব্যাপারে দারুণ দূর্নীতি দেখা দেয়। ব্যাংকের লোন বিভাগের বড় কর্তাদের খুশী না করে সহজে কারও লোন পাওয়ার উপায় ছিলনা। রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী দু'চার জন ছাড়া ব্যাংক কর্তাদের সঙ্গে বখরায় না এসে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকা লোন পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। শুনেছি কোটি টাকা পেতে হলে আট দশ লাখ খরচ করতে হতো, পঞ্চাশ লাখ হলে কম পক্ষে ৫/৬ লক্ষ টাকা দিতে হতো। কিন্তু আমার ব্যাপারে মুশকিল হয়েছিল যে আমাকে সবাই পলিটিকেল ম্যান বলে জানে। এক সময় এম. পি. ছিলাম আবার রাজনৈতিক পরিবর্তনে অদূর ভবিষ্যতে যে ক্ষমতায় আসব না তার নিশ্চয়তা কি? আমার থেকে বখরা নেওয়া তাই ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে সবাই আমাকে এড়িয়ে যেত। এছাড়া এদের সঙ্গে আমার খুব বেশী পরিচয় থাকার ফলে আমার কাছে আত্মপ্রকাশে এরা সম্মত হলো না। ১৯৪৮ সন থেকে '৭২সন পর্য্যন্ত আমার যে মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে এরা আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করলে তাদের বোধ হয় ক্ষতি হতোনা এবং আমিও উপকৃত হতাম। শেষে বুঝলাম বোতল ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে সঙ্গি না হলে এরা সহজে ধরা দিতে চায়না। তাই গত দশ বার বৎসরে আমি আমার পুরোনো বিদেশী ব্যাংকেই প্রয়োজনীয় ওভারড্রাফ্টের অভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেছি আর আমার পরে যারা ব্যবসা জগতে এসেছে তাদের অনেকেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর পূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে এরমধ্যে আমাকে দিনে দশবার কিনে দশবার বেচার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

www.pathagar.com

এই দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজে আমি অসাধু অফিসারদের পাশাপাশি এমন দু'চার জন সাধু অফিসারের দেখা পেয়েছি যাদের কথা আমি কখনও ভুলতে পারবনা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক এসে ওয়াপদার এক অফিনারের কাছে তার একটা ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করল। পয়াপদা কতগুলি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিনবে এবং ভদ্রলোক টেন্ডারে সর্বনিম্ন দর দেওয়া স্বত্বেও অফিসারটি দুমাস যাবত পারচেজ অর্ডার দিচ্ছেনা। ভদ্রলোকের ধারণা হলো অফিসারটি নিশ্চয়ই কিছু প্রত্যাশা করেন এবং সেটা না পাওয়া পর্য্যন্ত অর্ডার প্লেস করবেনা। আমার সঙ্গে কিছু প্রিন্টিং-এর কাজের মারফৎ এই অফিসারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় পরিচিত ভদ্রলোকটি আমাকে তার বাসায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করল। বহু অনুরোধের পর আমি রাজী হয়ে ভদ্রলোকটিকে অফিসারের র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটের বাসায় নিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক বললেন কথাবার্তা বুঝে যদি মনে হয় দক্ষিণা দেওয়া প্রয়োজন তবে আমি ইঙ্গিত করলেই তিনি হাজার পাঁচেক টাকা অফিসারকে দিবেন। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে অফিসারের বাসায় গিয়ে বাড়ীর চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অফিসারটি ছিলেন ওয়াপদার ডিপুটি ডাইরেকটর পারচেজ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী, নাম ছিল হাসান, পুরো নাম এখন স্মরণ করতে পারছি না। তাঁর হাত দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালামাল খরিদ হয়। আমার ধারণা ছিল তিনি বেশ বড় বাড়ীতে থাকেন। গিয়ে দেখি একটি তিন কামরার ছোট এক তলা বাড়ীতে পরিবার নিয়ে থাকেন। সামনে ছোট একটি বারান্দা তাকেই পুরোনো চটের পর্দা দিয়ে বৈঠকখানা করা হয়েছে। ঘরের ভিতরের পর্দাও দেখলাম চটের। আসবাব পত্র অতিশয় পুরোনো দীনহীন। পুরোনো নড়বড়ে কাঠের চেয়ার। দেখে আমি বেশ বিস্মিত হলাম। ভদ্রলোক বাসাতেই ছিলেন। সমাদর করে আমাদের সামনের বারান্দায় বসালেন। একটু পরে চায়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য চটের পর্দা টেনে ভিতরে গেলেন। আমি ও আমার সঙ্গী একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে চোখ টিপে হাসলেন—অর্থাৎ এখন বুঝতে পারছেনত? এখানে আসতে সম্মত হওয়ার পূর্বে আমি তাকে বলেছিলাম অফিসারটি আমার যতদূর মনে হয় সৎ। ঘুষ টুস খাননা। কিন্তু ভদ্রলোক জোর দিয়ে বলেছিলেন উনি

www.pathagar.com

খবর নিয়ে জেনেছেন বাইরে অফিসারটি খুব সাদাসিধা হলেও ভিতরে অন্য রকম। তাই ওনার চোখ টিপি দেখে আমারও বিশ্বাস হনো তার কথাই ঠিক। এই ভাঙ্গা নড়বড়ে চেয়ার, পুরাণ চট দিয়ে দরজা জানালার পর্দা বানান সবটাই ভড়ং। মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টা যাতে কারও সন্দেহ না হয়।

একটু পরেই ভদ্রলোক চা ও বিস্কুট নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছোট দুটো চায়ের বাটির একটার হাতল ভাঙ্গা। একটি বেকাবিতে স্কুল বিস্কুটের মত ছোট ছোট কয়েকখানা বিস্কুট। চায়ের বাটি ও বিস্কুটের চেহারা দেখে এবার আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো লোকটি অত্যন্ত অসাধু ও দারুণ ধূর্ত। লাখ লাখ টাকা বানাচ্ছে কিন্তু বাইরের জীবন যাত্রা এমন রেখেছে যেন কারও তিলমাত্র সন্দেহ না হয়। এর পর নানা বিষয়ে আলাপ করে আমাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। শুনে ভদ্রলোক খানিকটা গম্ভীর হয়ে বললেন যে এরকম একটা ফাইল তার টেবিল আছে, দুচারদিনের মধ্যে তিনি তাঁর মতামত দিবেন। তখন আমি ইশারা করতেই আমার সঙ্গী পাঁচ হাজার টাকার নোট ভর্তি একটি বড় এনভেলপ ভদ্রলোকটির সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। অফিসার ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন ও বললেন মোহাইমেন সাহেব আপনার বন্ধুকে সম্ভব হলে আমি এমনিতেই সাহায্য করব, টাকা লাগবেনা। আমি জোর করে হেসে বললাম ও কিছু নয় আপনার ছেলে মেয়েদের চা নাস্তার জন্য সামান্য……। শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মলিন মুখে খুব করুণ সুরে কয়েকটি কথা বললেন যা এখনও আমার কানে বাজছে এবং তা' আমি জীবনে ভুলতে পারবনা। তিনি বললেন ঃ মোহাইমেন ছাব ম্যায় ইউপিকা এক শরিফ ঘারকা লাড়কা হোঁ। পাকিস্তান হোনেকা ওজেসে হামারা সাব কুছ চালা গিয়া। সাব ছোড়কে হাম ইধার চলে আয়েহেঁ, আভি হামারা আওর কুছ নেহি হ্যায় সেরেফ ঈমান হ্যায়। আপকা হাত পাকাড়তা হুঁ এসকো আপ ছিন্‌নেকা কোশেস মাত কিজিয়ে। (মোহাইমেন সাহেব আমি ইউপির এক ভদ্র ঘরের সন্তান। পাকিস্তান হওয়াতে আমি সবকিছু হারিয়ে এদেশে চলে এসেছি এখন আমার আর কিছুই নেই, আছে শুধু ঈমানটুকু, এটাকে আপনি কেড়ে নিতে চেষ্টা করবেন না।) শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

আমাদের তিন জনই নিস্তব্ধ। ভাবলাম ব্যাপার কি। হাসান সাহেব বাণ্ডিলটি ছুঁয়েও দেখলেননা কত টাকা আছে। আমাদের ইতস্ততঃ করতে দেখে তিনি বললেন ওঠা লিজিয়ে মোহাইমেন সাব মুঝে শরমিন্দা মাতকিজিয়ে (মোহাইমেন সাহেব ওটা উঠিয়ে নিয়ে যান আমাকে লজ্জা দিবেন না)। আমার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করতেই তিনি টাকাটা উঠিয়ে নিয়ে সালাম জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লজ্জায় আমার মুখ কাল হয়ে গেল। পথে আসতে আসতে ভাবলাম ব্যাপার কি? লোকটি যদি সৎ হয় তবে আশ্চর্য্য রকমের সৎ। ইনভেলপে একশত টাকার পঞ্চাশ খানা নোট ছিল। দেখতে বেশ উঁচু দেখাচ্ছিল। ভদ্রলোক একবার হাতে নিয়ে দেখলেন না তাতে পাঁচ হাজার আছে না দশ হাজার আছে। তখনকার পাঁচ হাজার মানে আজকের লাখ টাকার সমান। যদি দেখে শুনে রেখে দিতেন তবে মনে করতাম টাকার অঙ্ক তার মনমত হয়নি বলে গ্রহণ করলেন না। কিন্তু তিনিতো ছুঁয়েও দেখলেন না। তখন মনে হলো লোকটি সত্যিই অত্যন্ত সৎ ও সাধু প্রকৃতির। চটের পর্দা, নড়বড়ে চেয়ার, হাতল ভাঙ্গা চায়ের পেয়ালা এগুলি কোনটাই ভড়ং নয়। ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। যা মাইনে পান তাতে এর বেশী উন্নত জীবনযাত্রা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এরকম সাধু একটা লোককে ঘুষ দিয়ে নষ্ট করতে যাচ্ছিলাম ভেবে লজ্জায় নিজেই মরে যাচ্ছিলাম। তার সেই কথাটা সারা পথ ধরে আমার কানে বাজছিল মোহাইমেন ছাব মেরে আভি আওর কুছ নেহি হ্যাঁয় সেওয়া ঈমান, আপকা হাত জোড়তেঁহেঁ ইসকো ছিন্‌নেকা মাত কুশেস কিজিয়ে (মোহাইমেন সাহেব এখন আমার আর কিছুই নেই ঈমানটুকু ছাড়া আপনার কাছে হাত জোড় করছি এইটুক আপনি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না) সেকথাটা এতদিন পরেও আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে নিজের অনিচ্ছাতেও পাপের গ্লানিতে মনটা ভারী হয়ে যায় আর লোকটির উদ্দেশ্যে সহস্রবার সালাম জানাই।

যাক, কিছুদিন পরে আমার পরিচিত ভদ্রলোকটি আমাকে এসে বললেন যে ফাইলটি রি-টেণ্ডারের আদেশ সহ বেরিয়ে এসেছে। পুরাতন টেণ্ডারের স্পেসিফিকেশনে এমন কতগুলি বাহুল্য জিনিষ ছিল যেগুলির সত্যিই প্রয়োজন ছিল না। এগুলি বাদ দিয়েই এবার টেণ্ডার বের হয়েছে এবং এতে ওয়াপদার কমকরে হলেও তিন লাখ টাকা বেঁচে যাবে।

www.pathagar.com

একজন সৎ কর্মচারী হিসাবে ওয়াপদার স্বার্থে অফিসার ভদ্রলোক সঠিক কাজই করেছেন বলে মন্তব্য করলেন।

ওয়াপদার উপরোক্ত অফিসারের কথা উল্লেখ করার পিছনে আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হলো সব অফিসারেরই ঘুষ নেওয়ার সুযোগ থাকে না। যারা ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি, লাইসেন্স, পারমিট, রিকমেনডেশান, তদন্ত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন শুধু তাদের এবং তাদের অধস্তন কর্মচারীদেরই ঘুষ নেওয়ার সুযোগ থাকে। অন্যদের সাধারণতঃ থাকেনা। তারা শুধু তাদের ঐসব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সহকর্মীদের সুযোগের সদ্ব্যবহার দেখেন আর ভিতরে ভিতরে বুক চাপড়ান, অবশ্য যারা সৎ ও সাধু তাদের কথা আলাদা। হালে লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশে আর কোন ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হলেও উপরি নেওয়ার ব্যাপারে বেশ একটা প্রশংসনীয় গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রকাশ দেখা দিয়েছে। এখন প্রত্যেক অফিসেই ফাইলটি যথা সম্ভব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পাঠানো হয় যাতে সেটা ডিস্পোজালের ব্যাপারে যত অধিক সংখ্যক লোকের হাতের সংস্পর্শের প্রয়োজন হয় যেন সবারই কিছু কিছু পাওয়ার সুযোগ ঘটে। ঘুষের সুযোগের কথার অবতারণা আমি এই জন্য করেছি যে যাদের ঘুষ খাওয়ার সুযোগ নেই তাদের সৎ থাকা আর পুরোপুরি সুযোগ থাকা সত্বেও লালসাকে অগ্রাহ্য করে সৎ থাকা এক কথা নয়। ঘরে খাওয়ার না থাকলে উপবাস করা এক কথা আর প্রচুর খাবার সম্মুখে থাকা সত্বেও ইচ্ছা করে উপবাস করতে মনের যে শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা আলাদা জিনিষ। ওয়াপদার উপরোক্ত অফিসারের আচরণ দেখে একথাটা আমার বারে বারে মনে হয়েছে।

ওয়াপদার মত পিডব্লিউডি ও সিএণ্ডবি দু'টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যেখানে অধিকাংশ অফিসারের ঘুষ নেওয়ার সুযোগ আছে এবং যাদের সুযোগ আছে তাদের মধ্যে শতে দু'চার জনের বেশী সৎ থাকে কিনা সন্দেহ। তবে যারা থাকেন তাদেরকে মনে রাখার মত। এমনি একটি লোকের দেখা পেয়েছিলাম আমি আইয়ুব আমলের শেষের দিকে। ১৯৬৮ সনে আইয়ুব আমলের দশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেন্ট্রাল পিডব্লিউডি আমাদের প্রেস থেকে একটি রঙ্গিন পুস্তিকা ছাপিয়ে নেয় ২৪ হাজার টাকায়। বিল দেওয়ার চার পাঁচ মাসের মধ্যেও যখন টাকা পাওয়া গেলনা

www.pathagar.com

তখন একদিন নিজেই আমি শেরে বাংলা নগরে অফিসের সর্বোচ্চ কর্তা সুপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সংঙ্গে দেখা করলাম। অফিসারটির কপালে দেখলাম কাল দাগ রয়েছে এবং মুখ ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি। প্রথমেই আমি কথা আরম্ভ করলাম এইভাবেঃ আপনার চেহারা দেখে আপনাকে একজন শিক্ষিত ধার্মিক মুসলমান বলে মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোন লোককে দিয়ে কাজ করালে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী তার গায়ের ঘাম শুকাবার আগে তার পাওনা দিয়ে দিতে হয়। আমি আপনার কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে এসেছি। তখন তিনি ঘটনা জানতে চাইলে আমি যখন ব্যাপারটা বললাম, তিনি ডিলিং এসিস্টেন্টকে ডাকিয়ে পেমেন্ট দিতে বিলম্বের কারণ জানতে চাইলেন। এসিস্টেন্ট বলল, বিলে অনেক অবজেক্শান আছে, স্যার। অফিসার তখন ফাইল আনিয়ে অবজেক্সন গুলো দেখে বললেন এই ভদ্রলোককে আজ দু'টোর মধ্যে চেক দিতে হবে, যা যা অবজেক্শান আছে আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এর পর আরম্ভ হলো খেলা। আধ ঘন্টা পরে পরেই অফিসার কেরানীকে ডেকে কতদূর হয়েছে জানতে চাইলে সে নূতন নূতন অবজেকশান নিয়ে আসে। অফিসারটি সেগুলি তখনই মিটিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পর কেরানীটি আবার নূতন পয়েন্টের উপর অবজেক্শান নিয়ে আসতে লাগল। এভাবে বেলা দু'টোর মধ্যে পাঁচ পাঁচবার পয়েন্ট তুলে কেরানী অবজেকশান দিতে থাকল আর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সেগুলি মিটাতে থাকলেন। আমি বেশ বুঝলাম যে চেক যাতে আজ দেওয়া না হয় তার জন্য হিসাব বিভাগের ছোট বড় সব অফিসার কেরানীর সঙ্গে জোট বেঁধেছে কারণ বিলের টাকার উপর সে বিভাগের সব অফিসারেরই কম বেশী পাওনা একটা থাকে যেটা আজ মারা পড়তে বসেছে। যাহোক আমি চুপচাপ বসে মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম আর ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন ঘাবড়া-বেননা চেক আপনাকে আজ দিয়েই যাব। এভাবে প্রায় দু'টো পর্য্যন্ত যখন লেখালেখি চললো এবং কেরানীটি আবার নূতন আপত্তি নিয়ে এল তখন তিনি পুরো পৃষ্ঠাটা লাল কালি দিয়ে কেটে নিচে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন No more objection, pay at once।

তখন কেরানীটি আর কি করবে, পনের বিশ মিনিটের মধ্যে চেক এনে আমার হাতে দিল এবং আমি যখন অফিসারকে অশেষ ধন্য-

www.pathagar.com

বাদ দিয়ে বেলা আড়াইটার দিকে অফিস থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন দেখলাম কয়েক জোড়া চোখ হিংস্র হায়নার দৃষ্টি নিয়ে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বলতে ভুলে গেছি, এই অফিসারটি একজন বাঙ্গালী, এবং নাম ছিল আফসারউদ্দিন। ঢাকার জিঞ্জিরা এলাকার অধিবাসী। পরে অনেকের কাছে শুনেছি এত গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও তিনি কোনদিন ঘুষ বা লোভ লালসার ধারে কাছে যাননি। যে পদে তিনি ছিলেন তাঁর পক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা কন্ট্রাকটারদের কাছ থেকে নেয়া কোন সমস্যাই ছিলনা। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এহেন ধার্মিক লোকটি জেনারেল ইয়াহিয়ার আমলে ৩০৩-এ দূর্নীতির অভিযোগে পদচ্যুত হন। অবশ্য রিভিউতে পরে তাকে পূণর্বহালের আদেশ দেওয়া হলেও অভিমান করে তিনি আর কাজে যোগ দেন নাই। অন্যায়ভাবে এ পদচ্যুতি তাঁর আত্মসম্মানে দরুণ ভাবে আঘাত করে, তাই অত্যাচারি সরকারের অধীনে তিনি আর চাকুরী করতে রাজি হলেন না। এই অফিসারটির কথাও জীবন ভর আমার মনে থাকবে।

বাংলাদেশ সি এন্ডবি বিভাগের আরও একজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে আমি ভাল ভাবে জানি, যিনি চাকুরী জীবনে বিবেকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে পদে পদে অপদস্থ হয়ে অত্যন্ত দুঃখময় জীবন কাটিয়েছেন। তার নাম হলো আনওয়ারুল আজিম। তিনি নিজে ঘুষ খেতেন না বলে ঠিকাদারেরা কাজ খারাপ করলে বিল পাশ করতে চাইতেন না। তাতে ঠিকাদারদের সঙ্গে তার বিবাদ তো হতোই, উপরিস্থ অফিসাররাও তার উপর বিরক্ত হয়ে নানাভাবে তাকে অপদস্থ করত। গৃহ নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ এসব বিভাগে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঘুসের একটা রেট বাঁধা আছে। কাজ ভাল করুক আর মন্দ করুক এ বখরা না দিয়ে যখন কারও উপায় নেই তখন সঠিক ভাবে কাজ কোন ঠিকাদারই করেনা, তাই একজন অফিসার সৎ হলে অপর সকলেরই অসুবিধা। এই অফিসার ভদ্রলোক শেষ পর্য্যন্ত এদেশে টিকিতে না পেরে কোন গতিকে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে বছর চার পাঁচেক চাকুরী করে এখন সরকারি চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে বেঁচেছেন। অনিচ্ছা সত্বেও উর্দ্ধতন অফিসারের চাপে কত ত্রুটিপূর্ণ বিল পাশ করতে গিয়ে মনকে

www.pathagar.com

ক্ষতবিক্ষত করতে হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। একটায় চারটার বদলে একটায় দশটা সিমেন্ট আর বালি দিয়ে তৈরী কত ইমারতের বিল তাকে অনিচ্ছা সত্বেও পাশ করতে হয়েছে, সে সব কাহিনী আনোয়ারুল আজিম সাহেবের কাছে শুনে বুঝেছি আমার মত আত্মীক মৃত্যু তাকেও কতখানি গ্রাস করেছে।

বেশী ঈমানদারির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বহু দিন পূর্বে চট্টগ্রামে আমি আর একজন মানুষকে কত কষ্ট সহ্য করতে দেখেছি সে কথাটা আমার আজও মনে আছে। কোলকাতা থেকে দেশ বিভাগের পর তিনি চট্টগ্রামে চলে আসেন স্ত্রী দুটি ছোট মেয়ে ও একটি ছেলেকে নিয়ে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছিলেন অবাঙ্গালী এবং খুব ধনী ঘরের মেয়ে। ভদ্রলোক আগের দিনের গ্রাজুয়েট হলেও চাকুরি ছেড়ে কলকাতায় ব্যবসা করতে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। এসময় দেশ ভাগ হয়ে গেল। চট্টগ্রামে এসে তাঁর খুব কষ্টে দিন কাটছিল। যাহোক কোন এক জন আত্মীয়ের চেষ্টায় লিকুইডেশনে যাওয়া মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের তিনি রিসিভার নিযুক্ত হলেন, মাইনে মাসে ৩৫০ টাকা। তাঁর কাজ ছিল ব্যাঙ্কের কাছে দেনাদারদের বন্ধকি সম্পত্তিগুলি মোকর্দ্দমা করে ডিক্রি করিয়ে টাকা উসুল করে ব্যাঙ্কের কাছে যারা টাকা পায় সে দেনা শোধ করা। কয়েক মাস কাজ করার পর একবার কি কারণে নয় মাস তাঁর বেতন বন্ধ থাকে। এসময় তিনি পরিবার নিয়ে প্রায় উপবাসের সম্মুখীন হলেন তবুও ব্যাঙ্কের উসুল করা একটি পয়সাতেও তিনি হাত দিলেন না। এর নাম ছিল সিরাজুল ইসলাম। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বাঙ্গালী চীফ জাষ্টিস আমিন আহাম্মদ সাহেবের তিনি আপন ফুফাত ভাই।

ইনি আমারও সম্পর্কে মামা হতেন বলে চট্টগ্রামে গেলে মাঝে মাঝে আমি তাঁর বাসায় যেতাম এবং খুব সৎ ও ঈমানদার মানুষ বলে বেশ শ্রদ্ধা করতাম। ওনার নয় মাস বেতন বন্ধ অবস্থাতে একদিন দুপুরে তাঁর বাসায় গেলাম, তাঁর স্ত্রী কিছুদিন পূর্বে মরা গিয়েছিলেন, বড় মেয়েটির বয়স তখন বছর বারয়েক, ছেলেটির বছর দশেক এবং ছোট মেয়েটি বছর সাতেক। আমাকে মেয়েরা অনুরোধ করল ভাই দুপুরে আমাদের এখানে খাবেন। আমি রাজি হয়ে খেতে বসে দেখলাম তরকারী নেই, শুধু ডাল ও আলুর

www.pathagar.com

ভর্তা। দেখে বুঝলাম কি কষ্টে তখন তাদের দিন যাচ্ছে। আমি অবশ্য তাদেরকে খুশি করার জন্য খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছি এটা দেখালাম এবং ডাল ও আলুতে কি পরিমাণ ভিটামিন ও খাদ্যপ্রাণ আছে খেতে খেতে তার সম্বন্ধে লেকচার দিতে লাগলাম। আর একদিনের কথা আমার মনে আছে, সেদিনও দুপুরে গেছি এবং মামার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দুপুরের খাবার সময় হয়ে যাওয়ায় তারা আমাকে তাদের সঙ্গে খেতে অনুরোধ জানাল। এ দিকে ক্ষিদেও পেয়ে গিয়েছিল, ধারে কাছে কোন ভাল হোটেল না থাকায় তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু খেতে গিয়ে আমার চক্ষুস্থির। গতবার আলুর ভর্তা ছিল এবার তাও নেই, শুধু ডাল এবং সেটাতে ডালের চাইতে পানির পরিমাণই বেশী। যাই হোক খেতে বসে বড় মেয়েটি দেখলাম খানিক লজ্জা বোধ করছে কিন্তু তাদের লজ্জা এড়াবার জন্য আমি খেতে খেতে এমনই মজার গল্প জুড়ে দিলাম যে দুমিনিটেই তারা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

তাদের যখন এমনিভাবে দিন কাটছে তখন একদিনের একটি ঘটনা আমার মনে আছে যেটা গভীর ভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছিল। মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের কাছে এক পার্টির একটি চা বাগান কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে বন্ধক ছিল। একদিন এক ভদ্রলোক চা বাগানের বন্ধকী ফাইলটি গায়েব করে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে নগদ ৫০ হাজার ও এক ঝুড়ি লিচু নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। প্রস্তাব শুনেই সিরাজুল ইসলাম সাহেব এত চটে যান যে ভদ্রলোক কে লাঠি নিয়ে মারতে গেলেন এবং গালাগালি করতে করতে সদর রাস্তায় উঠিয়ে দিয়ে এলেন। বাসায় এসে দেখেন যে ইতিমধ্যে তাঁর ছোট মেয়ে লিচুর কয়েকটি খাবার জন্য ছিঁড়ে হাতে নিয়েছে। দেখে তিনি রাগে বাঁশের কাটি দিয়ে মেয়ের হাতে এত জোরে আঘাত করলেন যে হাত থেকে লিচুত পড়েই গেল, মেয়েটির হাত ফুলে গিয়ে সপ্তাহ খানেক কষ্ট পেয়েছিল। পরে শুনেছি এ ঘটনা যেদিন ঘটে সেদিন তাঁর বাসায় উনোন জ্বলেনি, সেদিন তারা শুধু মুড়ি খেয়েই দিন কাটাচ্ছিল। এত সৎলোকের দুনিয়ায় বোধ হয় ভাত নেই। কিছুদিন পরেই তার রিসিভার সীপের চাকুরি চলে গেল। এসব বিভাগে নিয়ম হচ্ছে রিসিভার হিসাবে তুমি একশত টাকা যদি বকেয়া আদায় করতে পার নানা খরচ দেখিয়ে তিন ভাগের একভাগ ব্যাঙ্কের ফাণ্ডে জমা দেবে, বাকী

www.pathagar.com

দুভাগের একভাগ নিজে খাবে আর এক ভাগ উপর ওয়ালাদের দেবে। তিনি এ নিয়ম কোন দিনই পালন করেননি, আদায়কৃত পুরা টাকাই ব্যাঙ্কের ফাণ্ডে জমা দিয়েছিলেন। ফলে বৎসর খানেক চাকুরির পর তাঁর চাকুরি গেল এবং তার জায়গায় নতুন যে এক ব্যারিষ্টার ভদ্রলোক নিযুক্ত হলেন তিনি নাকি শুনেছি এই ব্যাঙ্কের রিসিভার থেকে শেষ পর্যন্ত খান তিনেক বাড়ীর মালিক হতে পেরেছিলেন।

চট্টগ্রামের আইস ফ্যাক্টরী রোডের উপর এই ভদ্রলোকের মামা শ্বশুরের প্রায় এক বিঘার একটি খালি প্লট ছিল। এই মামাশ্বশুরটি অবাঙ্গালী এবং দেশ বিভাগের পর পরই প্লটটি কিনে তিনি আফ্রিকা চলে যান। প্লটটি দেখাশোনার দায়িত্ব সির জুল ইসলাম সাহেবকে দিয়ে যান এবং প্লটের এক কোণায় একটি টিনের ঘরে তিনি থাকতেন। দেশ বিভাগের বার চৌদ্দ বৎসর পরেও যখন মালিক আফ্রিকা থেকে ফিরলনা তখন আমি তাঁকে বহুদিন পরামর্শ দিয়েছি দাখিলাপত্র, পরচা প্রভৃতি তাঁর নিজের নামে করে নেওয়ার জন্য। তাঁকে বুঝিয়েছি মালিক কোন কালে ফিরে এলে আবার তার নামে রেজিস্ট্রী করে দিলেই চলবে নচেৎ ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে। মালিকের বিনা অনুমতিতে সাময়িকভাবে হলেও কাগজ পত্রে মালিক সাজাকে তিনি ধর্ম ও ন্যায়নীতির বিরোধী গহিত কাজ মনে করে করতে রাজী হলেন না। পরে কেয়ার টেকার হিসাবে তাঁর মালিকের কাছে কিছু টাকা পাওনা হয়েছে মনে করে সে টাকার দাবীতে জমির এক অংশ তিনি এক মোটর মেকানিকস্ এর কাছে ভাড়া দিয়ে কিছু টাকা নিলেন। এটাই তাঁর জন্য কাল হলো। সে মোটর ড্রাইভার সেখানে গ্যারেজ বানিয়ে এমন সব লোককে আমদানী করতে আরম্ভ করল যে তখন বয়স্থা মেয়ে নিয়ে তার সেখানে থাকাই বিপদ হলো। যেহেতু জমির মালিকানা তাঁর নামে নয় তাই ড্রাইভারকে উঠিয়ে দিতে গিয়ে আইনগতভাবে ও তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। এর মধ্যে দুই মেয়েই বিবাহ যোগ্যা হয়েছে, তাই তাদের সম্ভ্রম, মান ইজ্জত বাঁচতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্লট ছেড়ে তাঁকে অন্যত্র সরে যেতে হলো এবং বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ড্রাইভার ও আশে পাশের লোক দখল করে নিল। জমির সত্যিকারের মালিক মামাশ্বশুর আর কখনও ফিরে আসেনি, বেঁচে আছে কিনা তাও কেউ জানেনা। বেশী ঈমানদারি দেখাতে গিয়ে এই ভদ্রলোক বিরাট একটি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন। কায়ক বৎসর পূর্বে তিনি দীনহীন অবস্থায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মারা গেছেন

www.pathagar.com

এবং তার ছেলে মেয়েরা ও আজ এখানে সেখানে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে দিন কাটাচ্ছে। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর আল্লার ইচ্ছায় দুটি মেয়েরই খুব ভাল বিয়ে হয়ে যায় এবং ছেলেটিও জাহাজ সার্ভের চাকুরি নিয়ে মোটামুটি ভালই আছে।

এই আত্মীক মৃত্যু প্রথমে কিভাবে আরম্ভ হয়েছে, সৎ থাকতে গিয়ে মানসিক আঘাতে আমার ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে ডিপুটি কন্ট্রোলার অব প্রিন্টিং কাজেম আলীর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আবার অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই চেয়ারে পরবর্তী-কালে হামিদ হোসেন নামে এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি যিনি ছিলেন সৎ ও সাধুতার একজন প্রতিমূর্তী, যার কথা আমি কখনো ভুলতে পারবোনা এবং এত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও যাদের দৃষ্টান্ত মনকে সবল রাখতে অনেকটা সাহায্য করত। ইনিও মূলতঃ বিহারের, পরবর্তীকালে কোলকাতার অধিবাসী ছিলেন। এই ভদ্রলোক যখন ডিপুটি কন্ট্রোলার হন তখন বি, জি, প্রেস ও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট প্রেস হয়ে গেছে, টাকার সে অবারিত স্রোতও বন্ধ হয়ে গেছে। তথাপি যা কাজ তখনও বাইরের প্রেসকে দেওয়া হতো তাতে ইচ্ছে করলে বৎসরে বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি এত সাধু প্রকৃতির ছিলেন যে নিজেতো এক পয়সা নিতেনই না অপরেও যাতে নিতে না পারে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। আমি লক্ষ্য করেছি আমরা তাকে একটি সিগারেট খাওয়ালে মিনিট দশেক পরে নিজের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের সিগারেটটি পরিশোধ করে দিতেন। অনেক সময় ভুলে, কখনও কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে দামী অসমাপ্ত সিগারেটের প্যাকেটটি তার টেবিলে ফেলে এলে দু'চার দিন পরে তার অফিসে গেলে ড্রয়ার খুলে তিনি প্যাকেটটি ফিরিয়ে দিতেন। লক্ষ্য করেছি ইতিমধ্যে একটি সিগারেটও খরচ হয়নি।

তাঁর চাকুরী কালে একবারই একটা বড় কাজের সুযোগ আসে ১৯৫৮ সনে প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটার লিষ্ট ছাপার কাজ '৫৭ সনে পূর্ব পাকিস্তানে ডিপুটি কন্ট্রোলার হামিদ হোসেনের তত্বাবধানে ছাপা আরম্ভ হয়। কাজটির সর্বমোট মূল্য ছিল প্রায় চার কোটি অর্থাৎ বর্তমানের প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার সমান। পূর্বে যে দু'জন বাঙ্গালী, আধা বাঙ্গালী অফিসারের নাম করেছি তারা তখন করাচিতে এই বিভাগের

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। এখানে বড় বড় কয়েকটি প্রেস যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তারা করাচির কর্তাদের সঙ্গে যোগ-সাজসে ছোট-ছোট প্রেসদের বঞ্চিত করে অধিকাংশ কাজই নিজেরা কুক্ষিগত করার মতলব করে। কাজ আরম্ভ হওয়ার দু'চার দিনের মধ্যে বড় বড় প্রেসগুলি দেখল তাদের স্বার্থ দারুণ ভাবে ব্যহত হচ্ছে। হামিদ সাহেব প্রত্যেক প্রেসের মেশিন ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কাজ ভাগ করে যতদূর সম্ভব ন্যায় নিষ্ঠ ভাবে বিতরণ করে দিতেন এবং কাকে কত কাজ দিলেন বিকেল বেলা দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে তার তালিকা টাঙ্গিয়ে দিতেন। এতে কারও কোন অভিযোগ থাকতোনা। যদি দেখতাম যে আজ আমি কম পেয়েছি পর-দিন গিয়ে দেখতাম সেদিন বেশী কাজ দিয়ে আমাকে অন্যদের সঙ্গে সমান করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে যখন সব কিছুই সুন্দর ও সন্তোষজনকভাকে চলছিল তখন হঠাৎ একদিন শুনলাম যে করাচির আদেশে তাঁকে অপ-সারণ করা হয়েছে। সেখান থেকে গজব আলী নামে বাঙ্গালী এক অফি-সারকে ভোটার লিস্ট মুদ্রণের সর্মস্ত ক্ষমতা দিয়ে চাকায় পাঠানো হয়েছে। এমনকি এ সম্পর্কে একজন পিয়ন নিযুক্তির ক্ষমতাও হামিদ হোসেন সাহেবের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। হামিদ সাহেবের এ পদ্ধতিতে কাজ বিতরণের ফলে করাচির অফিসারদের আস্থাভাজন নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রেসের স্বার্থ যখন নষ্ট হচ্ছিল তখন করাচি থেকে প্রথমে টেলিফোনে অনুরোধ এবং পরে ধমক কোনটাতেই যখন কাজ হচ্ছিলনা তখনই তাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। হামিদ হোসেনকে সরাবার পরেই রাতের বেলা মিনাবাজার বা ভানুমতির খেল আরম্ভ হলো। দিনের বেলা সবাইকে ছিটে ফোটা কাজ দেওয়া হতো এবং বিকেলে ছুটির পর দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে পেটোয়া প্রেসগুলিকে মোটা মোটা কাজ দেওয়া আরম্ভ হলো। পূর্বে দেওয়ালে তালিকা টাঙ্গানোর যে নিয়ম হামিদ সাহেব করেছিলেন তা বাতিল হয়ে গেল এবং কে কত টাকার কাজ পাচ্ছে তা আর কারো জানবার অবকাশ রইলনা।

হামিদ হোসেন সাহেবকে আমি একজন পাকা ঈমানদার বা বিবেক-বান মানুষ বলে জানতাম। আমার মনে হয় বিবেক যেটা সেটাই ঈমান। নামাজী মোত্তাকি লোক হলেই যে ঈমানদার হবে এমন কথা নেই। বরং বিবেকবান মানুষই ঈমানদার এটা নির্দ্বিধায় বলা চলে। আমি হামিদ

www.pathagar.com

সাহেবকে কোনদিন অফিসে জোহরের নামাজ পড়তে দেখছি কিনা মনে পড়েনা কিন্তু বিবেকের নির্দ্দেশ যে তিনি কঠোর ভাবে মনে প্রাণে মেনে চলতেন এটা আমি লক্ষ্য করেছি। কোলকাতা থেকে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে লোহার পুলের অপর পাড়ে গলির মধ্যে তের হাজার টাকা দিয়ে ছোট একটি দোতলা বাড়ী কিনে বাস করতেন। এখান থেকে তেজগাঁও পর্যান্ত ৬/৭ মাইল পথ তখন অফিসের গাড়ী ছিলনা বলে রিক্সায় ব বাসে যাতায়াত করতেন। বহু বৎসর পরে অবশ্য এই অফিসেও সরকারী গাড়ী দেওয়া হয়েছিল। আমি লক্ষ্য করেছি পাঁচটায় ছুটির পর কোন সময় আমরা যদি তাকে আমাদের গাড়ীতে আসতে অনুরোধ করতাম তিনি পারত পক্ষে আসতে চাইতেননা। শুধু যেদিন খুব বৃষ্টি বা অন্য কারণে রিক্সা বা অন্য যানবাহন পাওয়া যেতনা সেদিনই তিনি অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের সাহায্য নিতেন। এই মানুষটিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম বলে কালেভদ্রে গ্যাণ্ডারিয়া এলাকায় গেলে তাঁর বাসায় যেতাম। যে কোন কারণেই হোক আমাকে তিনি বেশ খানিকটা স্নেহ করতেন এবং আমার সঙ্গে মনখুলে কথা বলতেন। বেতন ছাড়া তাঁর আর কোন আয় ছিলনা বলে তাকে খুব সাধারণ জীবন যাপন করতে হতো। অবসর গ্রহণ করার পর আমার মনে আছে এক দিন তার বাসায় কথায় কথায় বললাম এবার ফজলি আমের দাম একটু চড়া, ফলন বোধ হয় এবার ভাল হয়নি। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন অত খবর রাখিনা। এবৎসর আম মাত্র একদিনই খেয়েছি। শুনে একটু দুঃখ লাগল এত বড় অফিসার ইচ্ছে করলে চাকুরী জীবনে কত টাকাইনা কামাতে পারতেন আর এখন ভদ্রলোক মৌশুমে একদিনের বেশী আম খেতে পারেন না। এর জন্য অবশ্য তাকে কোন দিন দুঃখ করতে দেখিনি। ঈমানদার মানষ হিসাবে আল্লাহ যখন যেভাবে রাখেন, সৎলোক হিসাবে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে এতেই তিনি খুশী ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন কারো কাছে তাঁকে হাত পাততে হয়নি। বৎসর চার-পাঁচ পূর্বে তার মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর বাসায় গিয়ে শুনলাম আগের দিন তার জীবনের শেষ সঞ্চয় ষাট টাকা তিনি ব্যাংক থেকে উঠিয়ে এনেছেন। এর পর কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ার পূর্বেই সসম্মানে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ তাঁকে বেহেস্ত নসিব করুক।

আমি আগেই বলেছি হামিদ সাহেব রীতিমত নামাজি লোক না হলেও

www.pathagar.com

বিবেকবান মানুষ ছিলেন, আর বিবেকই হলো সত্যিকারের ঈমান। এ সম্পর্কে বিখ্যাত বুদ্ধিজীবি মরহুম কাজি আব্দুল ওদুদের একটি ঘটনা আমার মনে আছে। ওদুদ সাহেব ধর্মে কর্মে ও নামাজ রোজায় তেমন বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু নীতিবান মানুষ হিসাবে তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। '৫২ সনের মাঝামাঝি একদিন আমি ও ছান্দসিক কবি মরহুম আবদুল কাদির ওদুদ সাহেবসহ কোলকাতায় শিয়ালদহ থেকে ট্রামে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে যাচ্ছিলাম। ইলিয়ট রোডের মোড়ে এসে ট্রাম পাল্টিয়ে আমাদেরকে ওয়েলেসলি যেতে হবে। শিয়ালদহ থেকে ইলিয়ট রোডের মোড়ে আসা পর্য্যন্ত যখন ট্রামের কণ্ডাক্টার টিকেটের পয়সা চাইতে এলনা আমরা নেমে পড়লাম, কিন্তু ওয়েলেসলির ট্রামে যখন উঠলাম দেখলাম ওদুদ সাহেব দুখানা টিকেট কিনেছেন। দু'খানা কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন পূর্বের ট্রামে টিকেট কাটা হয়নি তাই কোম্পানীর প্রাপ্য শোধ করার জন্য দু'খানা কিনলাম। আমি ও কাদির সাহেব কিন্তু একখানা করেই কিনেছি। তখন ওদুদ সাহেবের নীতি জ্ঞান দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কণ্ডাক্টার আসেনি, পয়সা চায়নি এবং ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমাদের দেওয়ার সুযোগ হয়নি তাই বলে পরবর্তী ট্রিপে সেটা শোধ দিতে হবে এতটা নীতির কথা আমাদের খেয়ালে আসেনি। তখন বুঝলাম এটাই হলো বিবেকের নির্দেশ আর এটাই হলো সত্যিকারের ঈমান। হামিদ হোসেন সাহেবের মধ্যেও প্রতিদিন কাকে কতটা কাজ দেওয়া হলো দেওয়ালে তার তালিকা টাঙ্গিয়ে দিয়ে সবার প্রতি সুবিচার করার প্রচেষ্টার মধ্যে আমি বিবেকের ও ঈমানের সেই প্রতিফলনই দেখেছি।

অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন কিছু বিতরণের ব্যাপারে হামিদ সাহেবে প্রবর্তিত পন্থা এতই কার্যকরি ছিল যে পরবর্তীকালে বি, টি, এম সির সুতা ও অন্যান্য সরকারি আধা সরকারি সংস্থা থেকে লোভনীয় কোন কিছু বিতরণের ব্যাপারে কাকে কত টাকার মাল বা কাজ দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন দেওয়ালে তার লিস্ট টাঙ্গিয়ে দিলে সুষ্ঠ বিতরণ অনেকটা নিশ্চিত করে দূনীতির সুযোগ বেশ খানিকটা বন্ধ করা যেত বলে আমি মনে করি। এ সম্পর্কে দু'একটি উদাহরণ আমি উল্লেখ করছি। টেলিফোন বিতরণ নিয়ে দেশ বিভাগে পর থেকে যে কেলেঙ্কারী চলে আসছে তা অবর্ণনীয়। দরখাস্ত দিয়ে কোন লোক দশ বৎসরেও টেলিফোন পাচ্ছেনা আবার দরখাস্তের পর সাত দিনেও টেলিফোন পেতে আমি অনেককে দেখেছি। ১৯৬৮

www.pathagar.com

সন থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত আমাদের প্রেসে টেলিফোন নির্দেশিকা (গাইড) বইটি ছাপা হতো। সে উপলক্ষে টেলিফোন বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী প্রায়ই আমার এখানে আসতেন। তাদের সঙ্গে আলাপে জেনেছি তখন রেট ছিল প্রতিটি ফোন ৫০০, টাকা করে। যথাস্থানে ঐ টাকাটা দিলে এক সপ্তাহে টেলিফোন সেট পাওয়া যায়। একজন এসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর টাকাটা নিতেন, উপরে কাউকে কিছু দিতে হত কিনা জানিনা তবে এ বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা বলত ঐ অফিসারটির মাসিক নিম্নতম আয় ছিল তখন কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা। আমি অনেক ভেবে দেখেছি এই দুর্নীতিটা হামিদ হোসেন সাহেবের প্রবর্তিত দেওয়ালে তালিকা টাঙ্গানোর পদ্ধতিতে বন্ধ করা যেত। যদি নিয়ম করা হতো যে প্রত্যেক দরখাস্তকারীকে দরখাস্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সিরিয়েল বা ক্রমিক নম্বর দেওয়া হবে এবং এর পরে যাদেরকে টেলিফোন বিতরণ করা হবে তাদের নাম এবং সিরিয়েল নং এবং দরখাস্ত করনের তারিখ পত্রিকা মারফৎ ঘোষণা করা হবে তাহলে পত্রিকার ঘোষণা অনুযায়ী কারও সিরিয়েল ডিঙ্গিয়ে অন্যকে টেলিফোন দেওয়া হলেই সত্যিকার প্রার্থি যে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে পারত, তাহলেই আগের লোকের নাম চেপে রেখে পরের লোককে টেলিফোম দেওয়া সম্ভব হতোনা। কিন্তু সবই সবার অজান্তে ফাইলবন্দি থাকার সুযোগে সব জায়গায় আগের দরখাস্তকারীর নায্য অধিকার নষ্ট করে খেয়াল খুশি মত টাকা নিয়ে পরের লোককে টেলিফোন দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল এবং এখনও হচ্ছে। এ ভাবেই সর্বত্র দুর্নীতির বিস্তার সম্ভব হচ্ছে এবং দিন দিন তা মারাত্মকভাবে সর্ব বিভাগে বিস্তার লাভ চালছে। আজকে দেশের সব নাগরিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে এই ফাইলবন্দির গোপনীয়তার কারনেই বঞ্চিত হচ্ছে। দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে বা পত্রিকা মারফৎ ঘোষণা করে প্রার্থীদের দরখাস্তের তারিক, তার সিরিয়েল এবং ফলাফল ঘোষণা করার নিয়ম প্রবর্তন বাধ্যতামূলক করণে দেশের দুর্নীতির সুযোগ রাতারাতি প্রায় ৮০ ভাগ কমে যাবে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় রেল স্টেশনে দেখা যায় রাত্রে প্রথম শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করতে গেলে শুনতে হয় সব সিটই তিন চার দিন পূর্বে রিজার্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আধঘন্টা একঘন্টা আগে গিয়ে ট্রেনের কনডাকটর গার্ডকে দশ বিশ টাকা দিলেই কিছুক্ষণ পূর্বে ক্যানসেল

www.pathagar.com

হয়েছে এ কথা বলে দু'এক খানা বার্থের টিকিট আপনি পেয়ে যাবেন। আসল ব্যাপার হলো রিজার্ভেশন বিভাগের লোকেরা আগে থেকেই কতগুলি ভুয়া নামে অধিকাংশ সীট রিজার্ভ করে খাতায় লিখে রাখে। আপনি গেলেই বলবে সীট নেই এবং পীড়াপীড়ি করলে খাতা খুলে দেখাবে সব সীট বুকড।

এরও প্রতিকার হলো সেই বোর্ডে প্রকাশ্যে তালিকা টাঙ্গানো। সেই বোর্ডে পরিষ্কর ভাবে অগ্রিম বুকিংকারির নাম ঠিকানা, তার টেলিফোন নম্বর ও ইস্যু করা টিকেটের নম্বর উল্লেখ থাকবে। তারপর বোর্ডে উল্লেখ থাকবে ওয়েটিংলিস্টে যারা থাকতে চায় তাদের নাম ঠিকানা টেলিফোন নম্বর। যারা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী সাধারণতঃ আশা করা যায় তাদের প্রত্যেকের টেলিফোন নম্বর থাকবেই। এখন অগ্রীম টিকেট ক্রয়কারিদের কেউ ভ্রমণ বতিল করে টিকেট ফেরৎ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ওয়েটিং লিস্টে সর্ব প্রথম নামের লোকটিকে ফোনে জানিয়ে দিয়ে টিকেট নিয়ে যেতে বলা হবে। এভাবে যত লোকই ভ্রমণ বাতিল করবে ওয়েটিং লিস্টের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী নিচের দিকের লোককে খবর দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করলেই বর্তমান রেলওয়েতে সীট রিজারভেশন নিয়ে যে দুর্নীতি চলছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। পশ্চিম বঙ্গে টিকেট রিজারভেশনের ব্যাপারে এ নীতিটা সঠিকভাবে পালিত হতে দেখেছি এবং জনসাধারণও তার সুফল পাচ্ছে।

বহুদিন থেকে চট্টগ্রামে জেটিতে রেলওয়ে ওয়াগণের ব্যাপারে আর এক মারাত্মক কেলেঙ্কারী দেখেছি ওয়াগন বিতরণের ব্যাপারে। জেটি থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাল পাঠাবার জন্য ওয়াগন চাইলেই বলে যে ওয়াগন নেই। দশ পনর দিন কখনও একমাস অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি ওয়াগন প্রতি তিন চার শত টাকা খরচ করেন তবে দু'দিনেই ওয়াগন পেয়ে যাবেন। এখন নাকি রেট ওয়াগন প্রতি হাজার এগারশত টাকা চলেছে। ওয়াগন বিতরণ যাদের হাতে তাদের এটা কারসাজি। থাকলেও বলবে ওয়াগন নেই। এটা বন্ধ করারও একমাত্র পথ হলো হামিদ হোসেন সাহেবের পদ্ধতি গ্রহণ-অর্থাৎ বড় করে সুস্পষ্ট ভাবে বোর্ডে লিখে দেওয়া গত এক সপ্তাহে এবং আগামী দশ পনের দিনে কাদের নামে কত নম্বর ওয়াগন কোন স্টেষনে বুক করা হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ। সেখানেও বোর্ডে বড় করে ওয়েটিং লিস্টে প্রার্থীদের নাম ঠিকানা ও টেলিফোন নং এর

www.pathagar.com

উল্লেখ থাকবে। আসল ব্যাপার হলো জেটি কর্তৃপক্ষের হাতে খালি ওয়াগন কতগুলি আছে এবং কার কার নামে কোন ষ্টেশনে বুকিং আছে এটা কাউকে জানতে দেওয়া হয়না। তাই ওয়াগনের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ক্লিয়ারিং এজেন্টের মারফত ওয়াগন প্রতি মোটা টাকা নিয়ে ওয়াগন প্লেস করে দেয়। কিন্তু বোর্ডে বিস্তারিত বিতরণ, ওয়াগন নং এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকলেই এ ভাওতাবাজি আর সম্ভব হবেনা এবং রেল-ওয়েতে ওয়াগনের ব্যাপারে একটা বহুদিনের দুর্নীতিকে অনেকটা প্রশমিত করা সম্ভব হবে। তাতে মাল আনা নেওয়ার খরচ কমলে জিনিসের দামের উপরও তার প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য। কথা হলো গভীর ভাবে চিন্তা করলে সব সমস্যারই একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। দুর্নীতিও একটি সামাজিক সমস্যা এবং এরও সমাধান আছে। তবে এটা দেশের আর্থ-সামাজিক কাটামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এটার সমাধানও বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে হবে। অবশ্য সরকার যারা চালাচ্ছেন তাদের সত্যিকার ইচ্ছা যদি থাকে তবেই এটা সম্ভব, নচেৎ নয়। '৭২ সনে বিদেশ থেকে যখন কোটি কোটি টাকার সাহায্য আসছিল তখন বিতরণের ব্যাপারে এই নীতিটি গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অনেক অফিসেই, অনেক নীতি নির্ধারণ কমিটিতে বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কেউ কথা শুনেনি বরং ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করতে গিয়ে অনেক সমিতিতেই আমি অপদস্থ হয়েছি।

ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকের সাথে কাজ করতে গিয়ে সম্প্রতি কিছু দিন আগে এক সমিতি থেকে আমাকে কিভাবে অপদস্থ হয়ে সরে আসতে হয়েছে তার উল্লেখ এখানে করছি। ঢাকায় মুন্ন রোগের-চিকিৎসার জন্য একটি সমিতি রয়েছে। এ সমিতির সঙ্গে আমি বহুদিন ধরে জড়িত এবং এটির জন্য আমার আত্মীয় স্বজন থেকে আমি দুই লক্ষাধিক টাকা সাহায্য হিসাবে যোগাড় করে দিয়েছি। এখানে বহু রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয় বলে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার একটা গভীর মমতা ও আন্তরিক ভালবাসা ছিল এবং এই জন্যেই আমি এত টাকা সাহায্য যোগাড় করেছিলাম। আর যারা এটা পরিচালনা করছিলেন তাদের মধ্যে মধ্যমনি যিনি ছিলেন তাঁকে বরাবরই আমি একজন ফেরেস্তা মনে করতাম। আমার মনে হতো এমন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। পরহিতার্থে

www.pathagar.com

ইনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। শীতের দিনেও যখন তাকে দেখতাম ভোর ৭টায় এসে হাজির হয়েছেন এবং তিনি উপস্থিত হয়েছেন বলেই সব কর্মচারীরা ৭টার আগেই হাজির হতে বাধ্য হয়েছে তখন এরূপ একটা সমিতির পরিচালনা কমিটিতে আছি বলে গর্বে বুক ভরে যেত।

এ সমিতির কার্য্যকরি পরিষদের মিটিংগুলিও এমনি ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে হতো যে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সাধারণতঃ প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে শনিবার বেলা ৪টার মিটিং এর সময় দেওয়া হতো এবং ঠিক ৪টায় মিটিং আরম্ভ হতো। কোনদিন এক মিনিট লেট হতে দেখিনি বরং কোন কোন দিন আশ্চর্য্য হয়ে দেখেছি ২/১ মিনিট আগে মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। এর প্রধান পরিচালকের সময়নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি, মনে মনে ভেবেছি এরূপ এক আধ জন মানুষ যে দেশে আছে সে দেশ সত্যি ভাগ্যবান। এই প্রধান পরিচালক মহাশয় নিজে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি নাকি দিনে ৪/৫টির বেশী রোগী দেখেননা, অর্থাৎ তাঁর বাসা খরচ হয়ে গেলেই হলো। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর যে খ্যাতি আছে চাইলে দিনে ত্রিশ চল্লিশ জন রোগী তিনি দেখতে পারতেন। অর্থাৎ মাসে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা আয় করা তাঁর জন্য কোন কষ্টই ছিলনা। সেখানে দিনে ৪/৫টি রোগী দেখা মানে মাসে ৫/৬ হাজার টাকা আয়ের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখা কতটুকু নির্লোভতার পরিচয় এবং দেশও দেশের মানুষকে কতটুকু ভালবাসলে এটা সম্ভব ভেবে আমি আশ্চর্য্য হতাম এবং এ মানুষটির জন্য মন আমার শ্রদ্ধা ভক্তিতে ভরে যেত। তাঁকে আমি একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে কল্পনা করে মনে মনে পূজা করতাম।

অনেক সময় যখন বিভিন্নস্থানে আলোচনা হতো এদেশে কেউ কর্তব্য করতে চায় না, এদেশে কেউ সময় নিষ্ঠার ধার ধারেনা, চারটার মিটিং পাঁচটায়ও আরম্ভ হয়না, দেশ প্রেম বলে কারও মধ্যে কিছু নেই তখন আমি বলতাম ওমুক সমিতিতে গিয়ে দেখুন আর কোথাও সময়নিষ্ঠা না থাকলেও ওখানে আছে—চারটার মিটিং ঠিক চারটায় আরম্ভ হয়, অন্য কোথাও কর্তব্য স্বচেতনতা না থাকলেও ঐ সমিতিতে

www.pathagar.com

গিয়ে দেখুম কয়েকশ' কর্মচারী ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাজ করে চলেছে, দেশপ্রেম আর কোথাও না দেখলেও ওমুক সমিতিতে গিয়ে দেখুন একটি লোক আছে মাসে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার লোভ সংবরন করেও ৫/৬ হাজার টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিমগ্ন হয়ে আছে। বাংলাদেশে চারিদিকে চাইলে লোভ লালসার আগুনে সমগ্র দেশকে যখন একটা মরুভূমির মত মনে হতো তখন তারই মধ্যে শতাধিক নিবেদিত প্রাণ কর্মীর এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমার কাছে একটি মরুদ্যানের মত মনে হতো। অনেক সময় চারিদিকে মানুষের দায়িত্বহীনতা, অর্থলোলুপতা দেখে মন যখন খুব পীড়িত হয়ে পড়ত তখন ইচ্ছে করেই আমি ঐ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হাজির হতাম মনকে খানিকটা চাঙ্গা করার জন্য। শতাধিক কর্মব্যস্ত কর্মীদের সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত দেখে মনটা প্রফুল্ল হয়ে যেত, মনে হতো পীড়িত দেহে যেন খানিকটা নির্মল বাতাসের স্পর্শ লাগাচ্ছি।

কিন্তু বৎসর দুই আড়াই পরে ধীরে ধীরে আমার মনে হল কোথায় যেন একটি বড় রকমের কিন্তু রয়েছে। জনসেবার এই বিরাট আয়োজনের আড়ালে একটা বিরাট অর্থনৈতিক ঘাপ্‌লা রয়েছে। প্রথম প্রথম আমার মনে হতো এটা বোধ হয় দারুণ রকমের একটা অপচয়, কিছু লোক কেনা কাটা, সরবরাহ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিরাট অঙ্কের অর্থ লুটে নিচ্ছে কিন্তু তা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্তার অজ্ঞাতসারে ঘটছে, তাই বিভিন্ন মিটিং-এ এটা তার নজরে এনে প্রতিকারের চেষ্টা করলাম। আমার পীড়াপীড়িতে যখন দু'একটা ব্যাপারে রিটেণ্ডার করা হলো দেখা গেল যেখানে এক লক্ষ টাকায় অর্ডার দেওয়া হচ্ছিল সেটাই সাড়ে দশ হাজার টাকায় নেমে এল। যেখানে প্রতিমাসে কোন একটি আইটেমের জন্য গড়ে ৪৮ হাজার টাকা খরচ দেখান হচ্ছিল, যা আমার মতে দুই আড়াই হাজারের বেশী হতে পারেনা, অশেষ পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত যখন একটি ইনকয়ারি কমিটি তদন্তের জন্য গঠিত হলো তখন ঐ আইটেমের খরচই ৪৮ থেকে ধপ করে পাঁচ হাজারে নেমে এল। এতে অনেক মেম্বারই আমাকে সমিতির অনেক টাকা বাচিয়ে দেওয়ার জন্য সাধুবাদ জানালেও সর্বোচ্চ কর্তা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার উপর মহা খাপ্পা হয়ে গেলেন। তাঁর কথাবার্তায় মনে হলো

www.pathagar.com

এ সমস্ত অপচয় বা চুরি বন্ধ করতে গিয়ে আমি মহা অপরাধ করে ফেলেছি। বহু চেষ্টার পর যে ইনকয়ারি কমিটি গঠিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের কেনা কাটা ও টেন্ডার আহবান সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য সুদীর্ঘ সাত মাসেও তার কোন অধিবেশন বসলনা। শেষ পর্য্যন্ত আমার পীড়াপীড়িতে আমার সম্পূর্ণ অজান্তে একটা দায় সারা গোছের তদন্ত অনুষ্ঠিত হলো এবং সব কিছু ঠিক আছে বলে রিপোর্ট দেওয়া হলো। শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মিটিং-এ এ রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করে বললাম ভূ-ভারতে কেউ কখনও শুনেছে যে অভিযোগকারীর অজান্তে তদন্ত অনুষ্ঠি হয়? অভিযোগকারী হিসেবে আমি জানি কোন্ কোন্ ব্যাপারে, কোন্ কোন্ জায়গায় খোঁজ নিতে হবে, কোন কোন কাগজ দেখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এভাবে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার সামনে পুনরায় কাগজ পত্র দেখার জন্য আমি দাবি জানালাম। যাহোক আমার পীড়াপীড়িতে এবং আরও দু'চার জন মেম্বারের সমর্থনে শেষ পর্য্যন্ত পুনরায় তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হলো কিন্তু শেষাবধি এই প্রস্তাব কাগজ পত্রেই থেকে গেল, কার্য্যকর আর হলোনা।

এরপর এ সমিতির কার্য্যকরী পরিষদে থাকতে আমার ঘৃণা ধরে গেল। প্রথমে যে সব চুরি ও লুটপাট আমি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে ঘটেছে বলে মনে করতাম সেগুলি এখন এ কর্তা ব্যক্তির নির্দেশে এবং তার পূর্ণ সহযোগিতাতে ঘটছে বলে স্থির নিশ্চিত হলাম। দেশ সেবার নামাবলী গায়ে দিয়ে কত বড় লুন্ঠন এরা চালিয়ে যাচ্ছে ভেবে শিউরে উঠলাম। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট একটি বাড়ী তৈরী হচ্ছে, কত যে টাকা এযাবৎ খরচ হয়েছে তার হিসাব পত্র নেই। এযাবৎ টাকায় যত বহুতল বাড়ী তৈরী হয়েছে তার কোনটাতেই খরচ তিনশ চারশ টাকার বেশী ঘনফুট পড়ে নাই। এটার কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি, এর মধ্যেই নাকি ছয় সাতশো টাকা প্রতি ঘনফুটে খরচ পড়ে গেছে। কনস্ট্রাকশানে কোন আইটেমে কত টাকা খরচ হয়েছে অনেক মিটিংএ এ তথ্য জানতে চেয়েও জানতে পারিনি। এযাবৎ বাড়ীটির জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে শুনছি, শেষ পর্য্যন্ত আরও কত কোটি টাকা লাগবে জানিনা। ঠিক চারটায় মিটিং করাকে

www.pathagar.com

যেখানে আমি মনে করেছিলাম সময়নিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এখন বুঝতে পারছি সেটা ধাপ্পা দেওয়ার একটা বিরাট কৌশল। আমাদের দেশে মানুষ যতই সময়নিষ্ঠ হোক মিটিংএ সাধারণতঃ ৫/১০ মিনিট দেরীতেই আসে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় শতকরা ৯৯ জনই আসেনা। মানুষের এই স্বভাবকেই পুঁজি করে এখানে সুকৌশলে একটা মারাত্মক লুটপাট্ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই বড় কর্তার খুব আপন ৪/৫ জন এই কমিটিতে আছেন, তাঁরা প্রায় সবাই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও এক দেশের লোক। এরা সবাই ৪ টার মিটিং-এর ঠিক মিনিট পাঁচ সাতেক আগে এসে পৌঁছালে কোরাম হয়ে যায় এবং গত মিটিং এর কার্য্য বিবরণ যেহেতু আগেই সারকুলেট হয়ে গেছে তাই পড়া বা আলোচনা না হয়েই পাশ হয়ে যায়। পরের মিনিটেই আলোচ্য সূচীর দ্বিতীয় আইটেম গত মাসের হিসাব অনুমোদন প্রস্তাবটি প্রায় বিনা আলোচনায় পাশ হয়ে যায় মিটিং আরম্ভ হওয়ার ২/৩ মিনিটের মধ্যেই। দ্বিতীয় অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়টির পাশ হয়ে যাওয়ার পর অন্যান্য মেম্বাররা যখন হাজির হন তখন সমিতির বাড়ী তৈরীর অগ্রগতি ও বিবিধ ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করার থাকেনা। দু'এক সময় দেখেছি খরচ অনুমোদনের অতি আগ্রহে দু'এক মিনিট আগেও মিটিং আরম্ভ করা হয়েছে এবং দুই চারজন মেম্বার ঠিক সময় এসে যখন দেখলেন মিটিং আরম্ভ করে প্রথম দু'টি আইটেম পাশ হয়ে গেছে তারা সঠিক সময়ের পূর্বেই মিটিং আরম্ভ করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানালেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেব সে অভিযোগ কানেই তুললেন না। তড়িঘড়ি করে গত মাসের হিসাব পাশ করার রহস্যটা প্রথম দু'বৎসর বুঝতে পারিনি। পরে রহস্যটা শুধু আমার কাছে নয় আরোও দু'চার জন মেম্বারের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলেও যেহেতু অধিকাংশ মেম্বার তার অতি বশংবদ, আত্মীয় এবং রিটায়ার্ড অফিসার বা অত্যন্ত ব্যস্তবাগিস মানুষ যারা কোন ভাবে মিটিং শেষ করে বাড়ী যেতে পারলেই বাঁচেন এবং গভীর ভাবে তলিয়ে দেখবার সময় ও ধৈর্য্য যাদের নেই তাদের কাছে এ রহস্যটা বরাবরই চাপা রয়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারটা জানার পর যে মানসিক আঘাত আমি পেয়েছি তা অবর্ণনীয়। মনে হতো আমি যেন কোন অন্ধকার গভীর খাদে তলিয়ে যাচ্ছি। যাকে বরাবরই একজন ফেরেশ্‌তা মনে করে মনে মনে পূজা করে এসেছি, যাকে এই নৈরাজ্যের দেশে একজন আদর্শবান মানুষ হিসাবে

www.pathagar.com

মেন করে শক্তি পেয়েছে, তার আসল বা সত্যিকার চেহারা ও অর্থলুটের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানব সেবার নামাবলী গায়ে দিয়ে কী ভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বের করে নিচ্ছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সৎমনা দুইচার জনের সঙ্গে যখন আলাপ করলাম, তাঁরা বললেন এই কর্তা ব্যক্তির রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হতে উচু স্তরের সবারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না, চেপে যান। যেখানে দেশে বিরাট বিরাট প্রকল্পে শত শত কোটি টাকা লুট হচ্ছে কিন্তু কাজের বেলা কিছুই হচ্ছেনা, সেই জায়গায় এখানেতো অন্ততঃ কিছুটা কাজ হচ্ছে, অনেক লোক চিকিৎসা পাচ্ছে—তাই এ সান্তনা নিয়ে চুপ করে থাকুন এবং আমি তাই রয়েছি। পরে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপে জানলাম এদেশে সেবা মূলক বহু বড় বড় যত প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সব গুলিরই ভিতরের ইতিহাস নাকি এরকম।

যাই হোক যে প্রতিষ্ঠানে এভাবে চুরি ও লুন্ঠন চলছে সে সমিতির মিটিংএ উপস্থিত থেকে খরচের অনুমোদন দেওয়া মানে প্রকারান্তরে এ চুরির সঙ্গে নিজকে সম্পৃক্ত করা একথা মনে করে শেষ পর্য্যন্ত আমি কার্যকরী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে সরে আসলাম। আমার পদত্যাগের পর দুএক-জন মেম্বারের কাছে শুনেছি প্রেসিডেন্ট সাহেব নাকি দু'এক মিটিংএ বলে-ছেন মোহাইমেন সাহেবের এ প্রতিষ্ঠানের প্রিন্টিংএর কাজ করার ইচ্ছা ছিল, সেকাজ না পাওয়াতেই তিনি রাগ করে এরূপ আচরণ করেছেন। একথা বলে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু দু'একজন মেম্বার নাকি প্রতিবাদ করে বলেছেন প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনি মোহাইমেন সাহেবের প্রেসে কোনদিন যাননি, আমরা গিয়েছি। তার প্রেস এত বড় এবং সেখানে কাজের চাপ এত বেশী যে আপনার প্রতি-ষ্ঠানের দুই তিন হাজার টাকার কাজ করার জন্য তাঁর বিন্দু মাত্রও আগ্রহ নেই। তিনি শুধু সত্যি ব্যাপারটা কি, গলদ কোথায় তাই জানতে চেয়ে-ছিলেন। যাই হোক বিবেক ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিক্ত ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাকে ভারাক্রান্ত মনে আমার অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান থেকে সরে আসতে হলো।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার জন্য আমার ভক্তি শ্রদ্ধা এত উচ্চ মার্গে যাওয়ার আর একটা কারণ ছিল লোক মুখে শুনেছিলাম পীর দরবেশের

www.pathagar.com

তিনি ভীষণ ভক্ত। কোথাও সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনলেই হয় নিজে গিয়ে হাজির হন নতুবা তাকে আনিয়ে সেবা করেন। শুনে আমি চমৎকৃৎ হয়েছি এবং ভেবেছি ইনি শুধু মানব সেবাতেই নিমগ্ন নন, ধর্মের প্রতিও এর আসক্তি অসাধারণ। কিন্তু শেষ দিকে আমি বুঝতে পেরেছি এর পীর দরবেশের সেবা পুণ্য লাভের জন্য নয়, পাপ-স্খালনের জন্য। এ যেন অনেকটা কোলকাতার বিশেষ এলাকার মেয়েরা সারা রাত ধরে পাপ করার পর ভোর বেলা গঙ্গায় স্নান করে কলুষ মুক্ত হতে চেষ্টা করার মতো। আমার এ ধারনা হওয়ার কারণ হলো আমি শুনেছি চাকার বিভিন্ন পীর দরবেশের আস্তানায় প্রতি মাসে দু'এক বার করে মিষ্টি ও টাকা নিয়ে হাজীরা দেয় যারা তাদের অধিংকাংশ হলো ঘুষখোর অফিসার, দুর্নীতির জন্য যাদের বাজারে বেশ সুনাম আছে, আর নতুন উঠতি ব্যবসায়ী, শিল্প-পতি ও ঠিকাদারেরা বাংলাদেশ হওয়ার পর যারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে এবং দুর্নীতিই হলো যাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ অফিসার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করে এ প্রতিষ্ঠানে সেবার আগ্রহ নিয়ে অবৈতনিক ভাবে যোগদান করেছিলেন। ইনি আমার পূর্ব পরি-চিত। মাস তিনেক কাজ করার পরই তিনি এখানকার অনিয়ম, দুর্নীতি, কেনাকাটার ব্যাপারে আইন কানুনের প্রতি অবজ্ঞা দেখে পদত্যাগ করে চলে যান। পরে যখন আমি তাকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম তিনি বললেন আপনি কি জানেন? আমি আপনার চাইতে অনেক বেশী জানি। লক্ষ লক্ষ টাকার ঔষধ খরিদ হচ্ছে কিন্তু তার জন্য নিয়ম মাফিক টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে না। এছাড়া আরও অনেক ব্যাপার দেখেছি যা দেখে আমার চিত্ত জ্বলে গেছে। তাই সেবার ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে নিজের বিবেক বাঁচাবার জন্য নীরবে চলে এসেছি। আমি প্রেসিডেন্ট সাহেবের ভোর ৭ টায় অফিসে আসার কথা উল্লেখ করায় তিনি হেসে বললেন ওটাও উদ্দেশ্যমূলক। ইনি প্রতি ভোরে সমিতির কেন্টিনে এসে পেট ভরে নাস্তা করেন বিনা পয়সায়। অত ভোরে আসার উদ্দেশ্য হলো নাস্তার পয়সা বাঁচানো। আমি বুঝলাম ভদ্রলোক চাকুরি করতে গিয়ে অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি দেখে এতো মর্মাহত হয়েছেন যে এখন কোন কিছুই আর সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না, তাই সবটাতে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য আরোপ করছেন, তাই নাস্তার ব্যাপারে তার মতামতকে আমি খানিকটা বাড়াবাড়ি হিসাবে নিয়েছি।

আমার পদত্যাগের পর বন্ধু-বান্ধবের কাছে শুনলাম ৯০০ কেভিকার একটি জেনারেটার নাকি সমিতির জন্য ৪৬ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে। এত অস্বাভাবিক মূল্যে জেনারেটার খরিদের প্রস্তাবে কার্যকরী পরিষদের কোন কোন মেম্বার আপত্তি উত্থাপন করে, কারণ ঐ ধরনের জেনারেটারের মূল্য সর্বাধিক ৭/৮ লাখ টাকার অধিক হতে পারেনা। কিন্তু শোনা যায় তাদের আপত্তি উপেক্ষা করে জেনারেটারটি যখন কেনা হলো তখন তারা মূল্যের ব্রেক আপ চাওয়ায় তিনি নাকি জানালেন জেনারেটারের দাম পাঁচ লাখ টাকা এবং আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদির দাম ৪১ লাখ। অর্থাৎ ঘোড়ার দাম লাখ আর তার চাবুকের দাম দশ লাখ। শুনে মানুষ কেন, ঘোড়াও বোধ হেসেছিল।

এমনিভাবে ন্যায়নিষ্ঠ ও সততার সাথে কাজ করতে গিয়ে একজন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী বাঙ্গালী অফিসার আইয়ুব আমলে কি ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তার কথা উল্লেখ করছি। ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে পাবলিশারদের মধ্যে বই বিতরণের ব্যাপারে নানা অনিয়ম দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি প্রভৃতির কারণে টেকস্টবুক বোর্ডের খুবই দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। এসময়ে ঐ দশকের মাঝা-মাঝি ফজলুর রহমান নামে একজন অত্যন্ত দক্ষ, সৎ ও ব্যক্তিত্বশালী অফিসার বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে আসেন। ইনি আসার পূর্বে দেখেছি কোন অভিযোগ করে বোর্ডের নিকট পত্র দিলে দু'চার মাসেও তার জবাব আসতোনা, এলেও মূল সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক-হীন জবাব দেওয়া হতো। কিন্তু ফজলুর রহমান সাহেব আসার পর দেখেছি অভিযোগ করার একদিন কি দু'দিনের মধ্যেই উত্তর পাওয়া যেত এবং অভিযোগ সত্য হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করা হতো। এক-বার আমার মনে আছে বই বন্টনের ব্যাপারে কয়েকটি অভিযোগ জানিয়ে দর্শন প্রার্থনা করে তাঁকে পত্র দেই। একদিন পরেই তিনি সাক্ষাতের সময় জানালেন। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফজলুর রহমান সাহেব শিক্ষা বিভাগের যে শুধু একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ছিলেন তাই নয়, তাঁর মত জ্ঞানী, ভদ্র ও প্রত্যুৎপন্নমতির অফিসার আমি কম দেখেছি। শুনেছি শিক্ষা জীবনে তিনি নাকি কোন সময় সেকেণ্ড হন নাই, বরাবরই ফার্স্ট হয়ে-

www.pathagar.com

ছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যখন আমি কথায় কথায় আমার দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগের বাইরে একটি কথা বলতে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন আপনার পত্রে এ পয়েন্টের উল্লেখ নেই, তাই এটা আলোচনা করা যাবেনা। একথা বলে তিনি ফাইল খুলে আমার চিঠিখানা আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। দেখলাম আমার চিঠির গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক জায়গার নিচে লাল কালির দাগ দেওয়া আছে। বুঝলাম আমি আসার পূর্বে তিনি আমার অভিযোগপত্র পড়ে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দাগ দিয়ে রেখেছেন। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির মানুষ বলে আমার প্রত্যেকটি অভিযোগ তাঁর মনে রয়েছে এবং তার বাইরে কথা বলতে যেতেই নতুন বিষয়ের আলোচনা করতে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। দেখে আমি বিস্মিত হলাম। এর পূর্বে কোন বিভাগে কোন অফিসারের পূর্বাহ্নে অভিযোগপত্র পুরোপুরি পড়ে এভাবে প্রস্তুত হয়ে আলোচনায় বসতে দেখিনি। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে কতটুকু সচেতন হলে, সুবিচার করার কতটুকু আগ্রহ থাকলে একজন অফিসার এভাবে আলোচনার প্রস্তুতি নেয় ভেবে বিস্মিত হলাম। এর পর যত বারই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেছি টু দি পয়েন্টে আলাপ করতে হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারও পেয়েছি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ একজন যোগ্য ও সৎ অফিসারকে ঢাকার কোন একজন বনেদি প্রকাশকের স্বার্থ রক্ষার্থে তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খাঁর আদেশে টেলিফোনে ওএসডি করে দেওয়া হয়। অবশ্য বদলির পূর্বে প্রকাশকটির দাবী মেনে নিতে গভর্ণমেন্ট হাউস থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ফজলুর রহমান সাহেব সেটা রক্ষা করেন নি। ঢাকা টেকস্টবুক বোর্ডের জীবনে তাঁর মত দৃঢ়চিত্ত সৎ ও কর্মক্ষম চেয়ারম্যান আর বোধ হয় আসেনি। এবং তিনি আর দু'এক বৎসর থাকলে বোর্ডকে পুরোপুরি ক্লেদমুক্ত করতে সক্ষম হতেন বলে মনে হয়। তাঁর অপসারণ ছিল আমাদের মত ছোট এবং মাঝারি প্রকাশকদের স্বার্থের জন্য একটি দারুণ আঘাত। তাঁর সময়টি ছিল যেমন বোর্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ও উজ্জ্বল দিন তেমনি তাঁর পরে দুই মাহমুদের সময় ছিল সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখময় কাল।

www.pathagar.com

একাত্তর সালের ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামাবাদ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশকে সেবা করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি উচ্চ পদের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশে এসে কি ভাবে নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত মান ও প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সে কথাটা বলছি। এর নাম রহমত আরা হোসেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে অংকশাস্ত্রে এম,এ, তে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে লণ্ডন ইউনিভারসিটি থেকে প্রথম বিভাগে এম, এস, সি, পাশ করেন। এর পূর্বে বাঙ্গালী কোন মহিলা বিদেশী কোন ইউনিভারসিটি থেকে এত উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেননি। স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ বিখ্যাত সর্জেন্ট জহুরুল হকের ইনি আপন খালা—তাই পারিবারিক সূত্রেই রক্তের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের একটা মনোভাব এর মধ্যে ছিল। একাত্তরের মার্চে স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন তিনি ইসলামাবাদ সেন্ট্রাল উইমেন'স কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য উক্ত চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে তিনি যখন দেশে ফিরতে চাইলেন পাকিস্তান সরকার তার ইস্তাফা গ্রহণ করলেও দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন না। তখন লুকিয়ে বাহাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে খচ্চরের পিঠে চেপে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অতিকষ্টে কাবুল হয়ে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। বাহাত্তরের অক্টোবরে যখন তিনি তাঁর পূর্ব পদের সমতুল্য কোন একটি পদে নিযুক্তি প্রার্থনা করলেন তখন ইডেন কলেজের প্রিন্সিপালের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদে যোগ দিতে বলা হলো। প্রিন্সিপ্যালের পদটি আওয়ামী লীগের কোন মহিলার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বলে তাঁকে বলা হল।

যাহউক অনন্যোপায় হয়ে তিনি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে আওয়ামীলীগ সমর্থনকারী এক পুরুষ লেকচারারের দৌরাত্মে ইডেন কলেজে তখন দারুন ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল। হেন কাজ ছিলনা যেটা কলেজে অনুষ্ঠিত হতনা। নিয়ম শৃঙ্খলা বলে কোন কিছু ছিলনা বললেই চলত। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে তদানীন্তন অধ্যক্ষাকে সাসপেন্ড করার পর পঁচাত্তর সালে রহমত আরা হোসেনকে কলেজের অধ্যক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী মুজাফফর আহম্মদ ও শিক্ষা সচিব মোকাম্মেল হকের পরিপূর্ণ সহযোগিতায় কলেজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

www.pathagar.com

আনতে তিনি সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পুরাতন শিক্ষা সচিবের স্থানে কিছুদিন পরেই নূতন এক সি, এস, পি শিক্ষা সচিব এসে হাজির হন যিনি দু'চার দিনের মধ্যে কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। কলেজে গোলমাল সৃষ্টিকারী এক মহিলা লাইব্রেরিয়ান যাকে পূর্বেকার শিক্ষা সচিবের সহায়তায় বকশী বাজার কলেজে বদলী করা সম্ভব হয়েছিল নূতন সচিব এসেই ঐ মহিলার বদলীর আদেশ রহিত করলেন এবং উক্ত মহিলার বাসস্থান হোস্টেলের চারতলা থেকে এক তলায় স্থানান্তরের প্রিন্সিপালের আদেশটিও টেলিফোন যোগে রহিত করলেন। কলেজের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব একথা জেনেও শিক্ষা সচিব ঐ মহিলা যিনি তার আত্মীয়া এবং একই জেলার মানুষ বলে পরিচিত ছিল তার ব্যাপারে অহেতুক আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ৭ই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লবের পরে অত্যন্ত নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হলো। স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিরা একে অন্যকে ভারতীয় দালাল বলে বিপদগ্রস্থ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। এসময় তদানীন্তন শিক্ষা সচিবও তাঁকে ভারতীয় দালাল বলে আখ্যায়িত করে বিপদগ্রস্থ করবার চেষ্টা করছে জানতে পেরে তিনি ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বিলেত চলে গেলেন। শিক্ষা সচিবের সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠুভাবে কলেজ চালানো সম্ভব নয় এবং জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা চলেনা এ সত্য উপলব্ধি করেই হয়ত আট মাসের মধ্যে পূর্বেকার শিক্ষা সচিবের সহায়তায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যে উদ্দ্যোগ তিনি প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন সে প্রচেষ্টা ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাওয়াই তিনি নিরাপদ মনে করেছিলেন।

যা হউক লন্ডনে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে তিনি যখন লন্ডন থেকে ফিরছিলেন প্লেইনে বসে বাংলাদেশের দু'চারজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর মুখে শুনলেন যে রোকেয়া হলের মেয়েরা ছুরি কাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। এ থেকেই ছাত্রী হলগুলোতে নিয়ম শৃঙ্খলার কতদূর অবনতি হয়েছে সেটা তিনি কিছুটা অনুধাবন করতে পারলেন।

তাঁর ফেরার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য এবং তদানীন্তন সরকারের জনা তিনেক মন্ত্রীর অনুরোধে উনসত্তর সালের মার্চে রোকেয়া

www.pathagar.com

হলের প্রভোষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। দেশের ও হলের পরিস্থিতি দেখে প্রভোষ্ঠের কাজটাকে তিনি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ইচ্ছা ছিল যেভাবে হউক ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার প্রবর্তন করার। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তার প্রচেষ্টায় হলের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং হলের উন্নয়ন কাজও সুষ্ঠভাবে চলছিল। ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমান সাহেব বি. এন, পি. পার্টি সৃষ্টি করলেন এবং রোকেয়া হলেও তার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বে যেসব ছাত্রীরা হলে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল তারা এ দলে যোগ দিয়ে নানা কাজের অজুহাতে যখন তখন হলের বাইরে গিয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে আরম্ভ করল। হলের নিয়ম হচ্ছে স্থানীয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন ছাত্রী সন্ধ্যা ৭টার পর হলের বাইরে থাকতে পারেনা। একদিন দেখা গেল সেই বিশেষ ছাত্রী কয়েকজন রাত ১১টার দিকে হলে ফিরে এসে গেইট খোলার জন্য হৈহল্লা চেঁচামেচী আরম্ভ করছে। তারা কোন অনুমতি না নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। প্রভোষ্ট রহমতআরা বেগম তাদেরকে হলে ঢুকার অনুমতি দিলেন না। তাঁকে বলা হলো মেয়েদের সঙ্গে নাকি কোন একজন মহিলা মন্ত্রী এসেছেন। হলের আইন না মেনে যেসব মেয়েরা এত রাতে বাইরে কাটিয়েছে তাদেরে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে কোন মন্ত্রী তাঁকে পূর্বাহ্নে না জানিয়ে হলে আসতে পারেন এটা তিনি বিশ্বাসই করলেন না। তাই তিনি মনে করলেন মন্ত্রীর নামে তাঁকে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে। অতএব তিনি হলের গেইট খোলার অনুমতি দিলেন না।

যাই হউক এতরাতে গেইট খোলার জন্য উপাচার্যের অনুমতি প্রয়োজন একথা দারোয়ানের মারফৎ বলাতে সেই তথাকথিত মন্ত্রী মহোদয়া দারোয়ানকে নাকি বলেছিলেন যে এই ভদ্র মহিলা প্রভোষ্টের চাকুরী কিভাবে করে তা আমি দেখিয়ে দেব। যাই হউক সেইরাতে মহিলা বিষয়কমন্ত্রী ডঃ আমিনা রহমান টেলিফোনে অনুরোধ করায় এবং পরের দিন ঐ নিয়ম ভঙ্গকারী ছাত্রীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই আশ্বাস দানের পর প্রভোষ্ট রহমত আরা রাত ১২টার সময় গেইট খোলার অনুমতি দিলেন। ব্যবস্থা নেওয়া হবে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোন কিছু করা হলোনা। ফলে অন্যান্য মেয়েরাও অনুরূপ সুবিধা

www.pathagar.com

লাভের জন্য প্রভোস্টকে চাপ দিতে লাগল। এতে প্রভোস্ট মিসেস হোসেন দারুণ বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন।

পরে তিনি জানতে পারলেন ঐদিন রাত্রে মেয়েদের সঙ্গে সত্যিই স্বাস্থ্যবিষয়ক উপমন্ত্রি কামরুন নাহার জাফর এসেছিলেন। তার অনুরোধ না রক্ষিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন এবং প্রভোস্টের কাছে একটি লিখিত জবাবদিহি চেয়েছিলেন। প্রভোস্ট রহমত আরা হোসেন ঐ পত্রের একটি উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কিছুদিন পর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে তাঁকে হলে চার্জ বুঝিয়ে ডিপিআই অফিসে যোগদান করার নির্দেশ আসে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ নির্দেশ আসার কিছুদিন আগে একদিন প্রধান মন্ত্রীর বাসা থেকে হলের প্রভোস্টের বাসায় রাত সাড়ে আটটায় একটি বিশেষ ছাত্রী সেলিনা বেগমকে হল থেকে ডেকে আনার নির্দেশ আসে। হল প্রভোস্টের বাসায় কখনও কোন ছাত্রীকে ফোনে ডেকে দেওয়ার নিয়ম নাই। প্রভোস্ট রহমত তারা তখন বাসায় উপস্থিত না থাকায় তাঁর স্বামী প্রফেসর আতোয়ার হোসেন (বর্তমানে মরহুম) ঐ ছাত্রীকে ডেকে দিতে ইতস্ততঃ করায় সেদিন ধমক খেয়েছিলেন। পরে তিনি জানতে পারেন ঐ ছাত্রীর সঙ্গে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রীর প্রায় আধঘন্টা পর্যন্ত রাজনীতি ও অন্যান্য ব্যাপারে রসালাপ হয়েছিল। ইসলামবাদে অত্যন্ত সম্মানিত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশ সেবার উদ্দেশ্য তিনি বাংলাদেশে এসে এভাবে পুরস্কৃত (?) হয়েছিলেন। উক্ত ঘটনার পর তেক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি কয়েক বছর চাকুরীর মেয়াদ থাকতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে আত্মসম্মানে বাচিয়েছিলেন।

শিক্ষা ও অন্যান্য বিভাগের অফিসারদের কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণ স্তরের পুলিশ অফিসারদের মধ্যে আমি দু'চারজনকে দেখেছি সাধুতার দিক থেকে যাদের শ্রদ্ধা করা চলে। পাকিস্তান হওয়ার পর পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ স্তরে যারা ছিলেন এমনকি দেশ স্বাধীনতা লাভের পরও যারা আই.জি. পি. হিসাবে ছিলেন সাধুতার জন্য তাদের অনেককেই আদর্শ স্থানীয় বলা চলে। তাঁরা উঁচু পর্যায়ে ছিলেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নীচের দিকে এ সততা কচিৎ পাওয়া যায়।

পুলিশ বিভাগের নিচের দিকে আবহাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত অসহনীয় ও মর্মান্তিক যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পুলিশ শান্তি রক্ষা ও

www.pathagar.com

নিরাপত্তার প্রতীক, পুলিশকে দেখলে নিরাপত্তা জনিত শান্তির একটা অনুভূতিতে মন যেখানে হালকা হয়ে যাওয়ার কথা সেখানে আজকাল বাড়ীতে পুলিশ এসেছে শুনলে মানুষের পিলে চমকে যায়। প্রবাদ আছে "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা" কিন্তু পুলিশ ছুঁলে কত ঘা হয় বলা দুষ্কর। ইংরেজ আমল থেকেই নীরিহ জনসাধারণের উপর থানার দারোগা পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী একটা প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে আছে। এক বুড়ী যে কোন এক হাকিমকে খুশী হয়ে বলেছিল ঃ আল্লাহ্ তোমাকে দারোগা করুক, এ থেকেই ধারণা করা যায় ইংরেজ আমলে থানার লোকজন গ্রামের লোকের কাছে কতটা ত্রাসের বস্তু ছিল।

ইংরেজ আমলে থানার দারোগারা যে ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারে কিরূপ অসীম সাহসী ছিল তার একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি। আমার পিতার কাছে শুনেছি পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে ওসমান আলী দারোগা বলে একজন অত্যন্ত ষাঁদরেল দারোগা আমাদের অঞ্চলে কোন খুন জখমের তদন্তে গেলে একেবারে খোলাখুলি বাড়ীর উঠানে পাটি বিছিয়ে সবার সামনে ঘুষের টাকা নিত। একবার গ্রামের লোক একত্র হয়ে উপরে দরখাস্ত করলে এক ইংরেজ পুলিশ সুপার তদন্তে এলে গ্রামের লোক যখন তাঁকে বলল ওসমান আলী দারোগা বাড়ীর সামনে হোগলা পাতার ধাড়াতে বসে সবার সামনে ঘুষ নিয়েছে তখন সাহেব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল "সবার সামনে ঘুষ নিয়েছে"? গ্রামের সবাই যখন বলল ঃ হাঁ হুজুর, আমাদের সবার সামনে নিয়েছে তখন সাহেব সমস্ত ঘটনাটা অবিশ্বাস করে বলল "এরকম হতেই পারে না। সবার সামনে ঘুষ নেওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার" এই বলে কেস ডিসমিস করে দিলেন। সত্যি ব্যাপার হোল ওসমান আলী দারোগা এত দুর্দান্ত সাহসী ছিল যে ঐ ভাবেই ঘুষ নিত এবং জানত যে গ্রামের লোক অভিযোগ করলে সত্যি কথাই বলবে যা উপরওয়ালারা কোন কালেই বিশ্বাস করবে না।

দেশ বিভাগের পর ঘটনাচক্রে সম্পত্তির ব্যাপারে আমাকে দু'দুটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তখন থানা পুলিশ সম্পর্কে আমার যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা বর্ণনা করবার নয়। কোর্টে টেবিল চেয়ার থেকে দেওয়ালের ইট কাঠ পর্যন্ত টাকার জন্য হা করে থাকে। কেসের দিন হাজিরা রেকর্ড করাতে গেলে ষ্ট্যাম্প কোর্ট ফী বাবদ সরকারের পাওনা যদি দশ টাকা হয় বাকী আরোও নব্বই টাকা আলাদা খরচ দিতে

www.pathagar.com

হয় যেটা পেশকার, কোর্ট ইন্সপেক্টর পেয়াদা, পিয়ন, সিপাই প্রভৃতির পকেটে যায়। এ ছাড়া মানসিক অশান্তি ও আলাদা ভোগান্তিতো আছেই।

কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয় ক্যান্সার রোগে অনেকদিন ভুগে প্রাণত্যাগ করেন। শেষ দিকে ক্যান্সারের অসহ্য ব্যাথায় তিনি কাতরাতে কাতরাতে বলতেনঃ আল্লাহ যেন শত্রুকেও এ রোগ না দেয়। ফৌজদারী কেস লড়তে গিয়ে আমার অতীতে যে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে আত্মীয়ের কথা শুনে মনে হতো আল্লা যেন কোন শত্রুকেও ফৌজদারী কেসে না ফেলেন। ফৌজদারী কেসে পুলিশ রিপোর্ট এত গুরুত্ব-পূর্ণ যে থানার কর্মকর্তারা প্রায়ই দুপক্ষকে নিয়ে দস্তর মত লুফোলুফি খেলতে আরম্ভ করে। ধরুন বাড়ীর সীমানা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আপনার ফৌজদারী মামলা বেধেছে, প্রতিবেশী থানাতে কেস করল। আপনি ন্যায়সঙ্গত ভাবে আপনার নিজের সীমানাতেই দেওয়াল তুলেছেন কিনা দেখতে থানা থেকে একজন অফিসার দুজন সিপাই নিয়ে এল। আপনি তাদের চা-পানি খাইয়ে কিছু দস্তুরি দিয়ে দলীলপত্র দেখিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিয়ে ভাবলেন দাবী যখন সঠিক এবং কাগজপত্র দেখিয়ে তাদেরকে যখন সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন তখন রিপোর্ট আপনার পক্ষেই যাবে। কিন্তু দুদিন পরেই দেখ-বেন থানা থেকে আর একজন অফিসার আবার দুজন সিপাই নিয়ে নতুন ভাবে তদন্ত করতে এসেছে। এর মধ্যে আপনার প্রতিবেশী আপনার বিরুদ্ধে আবার নূতনভাবে কতগুলি অভিযোগ করে দরখাস্ত দিয়েছে, তাই আবার তদন্তের প্রয়োজন হয়েছে। এবার আবার নূতন করে নূতন অফিসার ও তার সঙ্গীদের খুশী করে আপনার পক্ষে যেন রিপোর্ট যায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। এভাবে কোর্টে কেসের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কতবার যে নূতন ভাবে পুলিশ তদন্তের সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে তার ঠিক নেই। এদিকে পুলিশের খেলাটা আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গেও একই ভাবে চলছে, তবে তার দাবীটা অন্যায় বলে হয়ত পুলিশকে খুশী করার জন্য খরচ পত্র করতে তার তেমন গায়ে লাগছে না। অনেক গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত লোককে বাড়ীতে চুরি হওয়ার পর থানায় এজাহার দিতে আগ্রহ প্রকাশ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তখন বলেছে, স্যার এমনি-তেই চোরের হাতে টাকা কড়ি সব হারিয়েছি, এখন পুলিশে খবর দিয়ে তাদেরকে খুশী করতে গিয়ে থালা, ঘটি, বাটি যা দু'চারটি আছে তাও হয়ত হারাতে হবে, সে ভয়ে থানায় যাইনি। অনেক ক্ষেত্রেই রিপোর্টের ব্যাপারটা

www.pathagar.com

যেন নিলাম ডাকের মত অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট হাইয়েস্ট বিডারের পক্ষেই যায় বলে মনে হয়।

আমার দু'বার ফৌজদারি কেস লড়বার সময় যে কয়দিন আমাকে থানায় আসা যাওয়া করতে হয়েছে সে সময় দেখেছি যদি কোন অবস্থাপন্ন বা সম্মানিত লোককে কোন কারণে বা কারও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এক বা দু'রাত্রি হাজত বাস করতে হয় তবে সেখান থেকে নিজের বিছানা বা নিজের বাড়ীর খাবার খাওয়ার অনুমতির জন্য বা গারদের ভিতরের নোংরা পরিবেশের বাইরে শোবার একটু জায়গা পাওয়ার অনুমতির জন্য বিলক্ষণ টাকা খরচ করতে হয়। একটু অবস্থাপন্ন মানী লোকের থানায় গ্রেফতার হয়ে আসাটা থানার লোকের জন্য একটা পৌষ মাসের মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তখন থানার সাধারণ সেপাই থেকে ও, সি, পর্যন্ত সবার মুখে যে তৃপ্তির হাসি দেখা দেয় সেটা দেখবার মত।

কোর্টেও দেখেছি আসামীর জামিন মঞ্জুর হয়ে গেছে কিন্তু কোর্ট ইন-স্পেক্টরকে উপযুক্ত দর্শনি না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি জামিনদারদের জামিন নেওয়ার আর্থিক স্বচ্ছলতা যে আছে তা স্বীকার করছেন না। জামিনদারা হয়তো দশ মাইল দূরের কোন গ্রামের বিশিষ্ট লোক। সেখানে তদন্ত করে তাদের আর্থিক সামর্থ্য যাচাই করে রিপোর্ট না আসা পর্য্যন্ত কোর্ট ইন্সপেক্টর জামিনদারদের তালিকা গ্রহণ করবেন না। তদন্ত হয়ে রিপোর্ট আসতে সাত দিন লাগবে, ততদিন হাজতে পচে মর। তাই মোটা একটা অংক খরচ করতে হয় যখন আর তদন্তের প্রয়োজন হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তালিকা গৃহীত হয়ে আসামীর জামিন হয়ে যায়। বিচার ও শাসনের নামে নিয়ত সরকারি স্টীম রোলারে পিষ্ট করে কিভাবে দেশের মানুষকে মনুষ্যত্বহীন, নিষ্ঠুর ও দায়িত্বহীন জীবে পরিণত করা হচ্ছে থানা ও কোর্ট কাচারীতে না গেলে তা ভালভাবে টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু দেশ বিভাগের পর পরই প্রথম দুই জন আই জি, পি, ছাড়া পরবর্তীকালে হাফিজুদ্দিন, মহীউদ্দিন, কাজি আনোয়ারুল হক, মেসবাহউদ্দিন, তছলিমউদ্দিন, আবদুল খালেক ও কিবরিয়া প্রভৃতি কয়েকজন অত্যন্ত সচ্চরিত্র পুলিশের সর্ব্বোচ্চ পদে আবির্ভাব হয়, যারা শেষ পর্য্যন্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধা, ভক্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলে ডি, আই জি আব্দুল্লা

www.pathagar.com

সাহেবও সৎ লোক হিসাবে পুলিশ বিভাগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন।

তাদের কথা বাদ দিলেও সাধারণ স্তরের পুলিশের আচরণের রেকর্ড আমাদের দেশে যেখানে অত্যন্ত অনুজ্জল সেখানেও সাধারণ অফিসারদের মধ্যে এমন দু'চার জনের হঠাৎ করে দেখা পাওয়া যায় যাদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত। নীচের দিকের এমনি দু'এক জনের কথা এখানে বলছি। খালেক সাহেব নামে আমার এক আত্মীয় বিভাগ পূর্ব কালে ডায়মণ্ড হারবার থানার ইন্টেলিজেন্স বিভাগে চাকরী করতেন। তার বাসা ছিল কোলকাতায় পার্ক সার্কাসে এবং অফিস ছিল লর্ড সিনহা রোডে। আমি সে সময় তার বাসায় থেকে বি, এ পড়তাম। একদিন ডায়মণ্ড হারবার এলাকার একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তার জন্য বিরাট আকারের একটা রুইমাছ নিয়ে এসে হাজির হলো। তখন খালেক সাহেব বাসায় ছিলেন না। তাঁর গৃহিণী মাছটিকে রান্না করে দুপুর বেলা অফিসে সাহেবের জন্য খাবার পাঠাবার সময় কয়েক টুকরা মাছ দিয়ে দিলেন আর দুপুর বেলা আমাদের কাউকে না দিয়ে সমস্ত মাছ রাত্রে খাবার জন্য রেখে দিলেন। অফিসে ভদ্রলোক টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলেই মাছের বড় টুকরা দেখে চমকে গেলেন। আর্দালী রওশন আলীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল ডায়মণ্ড হারবার থেকে এক ভদ্রলোক এনেছে। শুনেই তাঁর মনে হলো এ লোকটির তার কাছে নিশ্চয়ই তদন্তের কোন কেস আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর্দালিকে দিয়ে তিনি বলে পাঠালেন বাসার কেউ যেন এক টুকরা মাছও না খায়, আর মাছের মালিক যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

মাছের মালিক পরদিন ভোরে আর্দালির কাছে সব ঘটনা শুনে ভয়ে আর দেখাই করল না। ফলে দু'দিন ধরে বিরাট এক ডেকচিতে মাছের টুকরো পচতে লাগল। খালেক সাহেব কাউকে খেতে দিলেন না। তৃতীয় দিনে ঐ গুলো গন্ধ হয়ে যাওয়ায় ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হলো। ঘটনাটা খুব বড় নয়, লাখ লাখ টাকার ব্যাপারও নয় তথাপি এর থেকে একজন সাধারণ পুলিশ অফিসারের চরিত্রের নির্মলতার পরিচয় পাওয়া যায় যা সাধারণতঃ এই বিভাগের নিম্ন স্তরের অফিসারের মধ্যে পাওয়া যায় না।

বিভাগ পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে ডি আই ও ওয়ান হিসাবে তিনি যখন

www.pathagar.com

চাকরি করছিলেন তখন কক্সবাজার থানার একজন সাধারণ সিপাইকে তিনি কনস্টেবল হিসাবে পদোন্নতি দিলেন। লোকটি খুশি হয়ে দু'এক দিন পরে এক ঝুড়ি ফল ও তরকারী নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। দোতালার বারান্দা থেকে তিনি এগুলি দেখতে পেয়ে ঝুড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে অফিসে দেখা করতে বললেন। অফিসে গেলে লোকটিকে একটি চিঠি দেওয়া হলো যাতে তার পদোন্নতির আদেশ বাতিল করা হয়েছিল। এই খালেক সাহেব পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে পি, এস, পি পদে উন্নীত হয়ে এস, পি, হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ঘুষের ভয়ে তাকে সারাজীবন দেখেছি ইন্টেলিজেন্সে চাকরী করতে। এত সৎভাবে চাকরি করা সত্বেও মৃত্যুকালে তিনি যে সম্পত্তি রেখে যান তার বর্তমান মূল্য এখন কয়েক লক্ষ টাকা। তিনি ও তার স্ত্রী দুজনেই ক্লাশ ওয়ান অফিসার ছিলেন এবং খুব সাধারণ জীবন যাপন করে যে উদ্বৃত্ত তাদের হতো তা দিয়ে চাকার বিভিন্ন জায়গায় দেড় দু'হাজার টাকা করে তিন চার বিঘা জমি কিনেছিলেন। তখন এসব জমির ধারে কাছে রাস্তা ঘাট ছিল না। কিন্তু পরে যখন রাস্তা ঘাট হলো, এসব জমির মূল্য অসম্ভব বেড়ে গেলো এবং তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ৬০/৭০ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেল। খালেক সাহেবের উদাহরণ দেখলে সৎ লোককে আল্লাহ্ সাহায্য করেন এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই খালেক সাহেবকেই আগরতলা কেসের সময় ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি পাঠান হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে কিভাবে কেসে প্রধান আসামী করা যায় দেখার জন্য। খালেক সাহেব ইংরেজ আমল থেকে ইন্টেলিজেন্সে কাজ করছেন বলে এ ধরনের মোকদ্দমায় তার মতামত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবেই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখে তিনি স্পষ্ট মতামত দিয়েছিলেন যে ঘটনার সঙ্গে শেখ মুজিবের ইনভলভমেন্ট যতটুকু দেখা যায় তাতে তাকে কোন অবস্থাতেই প্রধান আসামী করা যায় না। বড়জোর দশ কি বার নং আসামী করা চলে। আইয়ুব খানও খালেক সাহেবের মতামত গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন কিন্তু গভর্ণর মোনায়েম খাঁর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত শেখকেই প্রধান আসামী করা হলো। মোনায়েম খাঁ আইয়ুবকে বুঝিয়ে ছিল বানানো স্বাক্ষীর জোরে শেখকে দেশদ্রোহী প্রমাণ করা সম্ভব হবে এবং তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা সম্ভব হবে।

পিন্ডি থেকে ফিরে এলে খালেক সাহেবের সঙ্গে যখন দেখা করি তিনি

www.pathagar.com

অত্যন্ত বিরক্তিকর সঙ্গে বলেছিলেন এরা কেসের কিছু বোঝে না। ভাবে সব কিছু গায়ের জোরে করা চলে। একেবারে দুধ ছাড়া দই কখনও বসে না। এটা শেষ পর্যন্ত এদের জন্য বুমেরাং হবে দেখে নিও। শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম খালেক সাহেবের কথা সত্য হলো। পুরা কেস আইয়ুব ও মোনায়েম খাঁর জন্য বুমেরাং হয়েছিল।

আমিনুল হক নামে আমার এক এডভোকেট আত্মীয় অতি সাধারণ পুলিশের মধ্যেও সাধু এক আধজন লোকের যে বিরল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার অভিজ্ঞতা আমাকে বলছিলেন। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে বিখ্যাত সাংবাদিক শহীদুল হকের ড্রাইভারের একটি দুর্ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ বিভাগ থেকে সমন নিয়ে একজন কনষ্টেবল এডভোকেট সাহেবের নিকট আসে। লোকটির প্যান্টে তালি এবং পায়ে ছেঁড়া জুতা দেখে তিনি অবাক হন। সাধারণতঃ পুলিশের লোকেরা যত ছোট চাকরিই করুক, নানাভাবে তাদের উপরি আয় একটা আছেই, তাই লোকটির ঐ দীনহীন অবস্থা দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হলেন। যাই হোক লোকটাকে তিন দশ টাকা বকশিস দিতে গেলেন কারণ পুলিশ বিভাগ থেকে কেউ কোন কাগজ নিয়ে এলে তাকে কিছু বকশিস দিতে হয় এটাই রেওয়াজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দশ টাকার নোটটি তার হাতে দিতে যেতেই সে নিতে অস্বীকার করে বললঃ স্যার, আমি হারাম খাই না। শুনে এডভোকেট সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

এতক্ষণ যে সব অফিসারের কথা বলেছি তাদের অধিকাংশের কার্যকাল হলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে। স্বাধীনতার পর এ ধরনের অফিসারের দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। কালে ভদ্রে এক আধ জনের দেখা যখন পাওয়া যায় তখন ঘন তমসার মধ্যে হঠাৎ বিজলি চমকের মতো চমকে উঠতে হয়, মনে হয় আমরা এখনও বোধ হয় একেবারে মরে যাইনি, এখনও বাঁচার সম্ভাবনা আছে। অল্প কিছুদিন পূর্বে লাখ খানিক টাকার একটা পেমেন্ট নেওয়ার জন্য আমাকে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের এক অফিসে যেতে হয়েছিল। আমি যখন সে অফিসে পৌঁছলাম তখন বেলা বারটা বেজে যাওয়ায় জেনারেল ম্যানেজার আমাকে বললেন আপনি কাল ভোরে আসুন দু'টার মধ্যেই চেক পেয়ে যাবেন। পরদিন হঠাৎ সাধারণ ধর্মঘট হওয়ায় সকালে আমি যেতে পারলাম না। টেলিফোনে এম, ডির সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন যে তিনি সেদিন দুপুরেই চাকা চলে

www.pathagar.com

যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে জেনারেল ম্যানেজারকে বলে যাবেন যাতে দু'টোর মধ্যে আমাকে চেক দিয়ে দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই এম, ডি, ভদ্রলোকটি একজন সি, এস, পি, অফিসার। বয়সে খুবই তরুণ! আমার জীবনে যে কয়জন ভদ্র ও নিষ্ঠাবান সি, এস, পি, অফিসারকে দেখেছি এঁকেও তাদের সঙ্গে এক তালিকায় ফেলা যায়।

যা হোক ধর্মঘটের পরে বেলা একটার দিকে যখন সে অফিসে পৌঁছলাম, দেখলাম ফাইনান্স ডাইরেকটর যিনি চেক দেওয়ার সত্যিকার মালিক তিনি তখনও আসেননি। ইনি স্থানীয় লোক, শহর থেকে বেশ কিছুদূরে থাকেন, ধর্মঘটের ফলে সময়মত পৌঁছুতে পারেননি। যাক তিনি যখন বেলা দেড়টার দিকে পৌঁছলেন দেখা গেল আমার ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এফ, ডি, কে বললাম ফাইল দু'মাস আগে ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে—শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন আপনি বসুন যেভাবে হোক আপনাকে আজ চেক দেওয়া হবে। আমি হতাশভাবে বললাম দু'টোর সময় আপনাদের অফিস ছুটি, চেক কি করে আজ দেবেন? এফ, ডি, বললেন সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনার চেক পেলেই হলো। এর মধ্যে তিনটা বেজে গেছে, অফিস ছুটি হওয়ায় প্রায় সব অফিসারই চলে গেছে। এফ, ডি, সাহেব ও চীফ একাউন্ট্যান্ট যারা দু'জনেই একত্রে চেকে দস্তখত করেন তাদের দু'জনারই সে রাত্রে ঢাকা চলে আসার কথা। ইতিমধ্যে চীফ একাউন্ট্যান্টও বাসায় চলে গেছেন। জেনারেল ম্যানেজার (জি, এম,) বারে বারে বলতে লাগলেন স্যার চীফ একাউন্ট্যান্ট চলে গেছেন দস্তখত করবে কে? ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর (এফ, ডি,) বললেন তাঁর বাসায় টেলিফোন করে তাকে আসতে বলেন। মোহাইমেন সাহেব একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাকে কথা দিয়েছি আজ চেক দেব, এর অন্যথা হবে না। বাসায় খবর নিয়ে জানা গেল চীফ একাউন্ট্যান্ট বাসায় নেই। এফ, ডি, বললেন তিনি নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে বাইরে যাননি। গাড়ি পাঠিয়ে যেখানে যেখানে তার থাকার সম্ভাবনা সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে তাকে নিয়ে আসুন। এর মধ্যে চারটা বেজে গেছে কিন্তু ফাইল তখনও পাওয়া যাচ্ছে না। জি, এম, সাহেব বললেন তিনি গতকাল অমুক অফিসারকে ফাইল দিয়েছেন। সেই অফিসার বলল তাকে ফাইল দেওয়া হয়নি। তখন এফ, ডি, সাহেব কঠোর স্বরে বললেন আমি আপনাদের পনের মিনিট সময় দিলাম এর

www.pathagar.com

মধ্যে ফাইল আমার টেবিলে চাই। যাই হোক এর আরো পনের মিনিট পরে ফাইল পাওয়া গেল। এর মধ্যে বহু খোঁজাখুঁজি করে প্রধান হিসাব রক্ষককে এনে হাজির করা হল। তখন সাড়ে চারটা বেজে গেছে। আমি প্রায় নিরাশ হয়ে এবং কিছুটা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে যখন উঠি উঠি করছি তখন এফ, ডি সাহেব বললেন এখন উঠবেন না—চেক নিয়ে তবে যাবেন। জি, এম, তখন কাতর হয়ে বললেন স্যার উনাকে কাল আসতে বলেন, চেক দিয়ে দেব। এফ, ডি, বললেন আমি ও সি. এ. আজ রাতে ঢাকায় চলে যাচ্ছি কাল চেক সাইন করবে কে? না আজই চেক দিতে হবে, উনাকে আমি কথা দিয়েছি।

বুঝলাম এফ. ডি. চেক দিতে বদ্ধপরিকর কিন্তু জি. এম, সাহেব কোমর বেঁধেছেন যাতে কিছুতেই আজ চেক দেওয়া না হয়। যেন দুই বড় অফিসারের প্রেস্টিজের লড়াই। তখন হঠাৎ জি. এম. সাহেব বললেন স্যার ওনাদের এগ্রীমেন্টে বেশ কিছু কাটাকাটি আছে, ষ্ট্যাম্প পেপারের উপর এগ্রিমেন্ট সই হবে। এখন পাঁচটা বেজে গেছে নতুন এগ্রীমেন্ট করার জন্য ষ্ট্যাম্প পেপার কোথায় পাব? এবার এফ. ডি. কে খানিকা যেন চিন্তাযুক্ত মনে হলো। আমি ভাবলাম জি. এম. সাহেব এবার যে প্রশ্ন তুলেছেন সে বাধা অতিক্রমের সাধ্য এফ. ডি. র নেই। আজই চেক দিওয়ার প্রতিশ্রুতি তাকে এবার প্রত্যাহার করতেই হবে। কিন্তু এই এফ. ডি. লোকটি দেখলাম দেখতে শুনতে ছোট খাট এবং তেমন আকর্ষনীয় চেহারার না হলেও কাজের বেলায় খুবই দক্ষ, দৃঢ়চিত্ত এবং বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন এগ্রীমেন্টটা নিয়ে আসুনতো দেখি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক বলে তার তখনই মনে হলো অধিকাংশ এগ্রী-মেন্টে শুধু প্রথম পাতাই ষ্ট্যাম্পে হয় বাকীটা থাকে সাদা কাগজ। এগ্রীমেন্ট আনলে দেখা গেল শুধু প্রথম পাতায় ষ্ট্যাম্প পেপার রয়েছে সেখানে কোন কাটাকাটি নেই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শুধু দু'এক জায়গাতে কাটাকাটি রয়েছে বাকি সব পৃষ্ঠা ঠিক আছে। তখন এফ. ডি. বললেন প্রথম পৃষ্ঠায় যখন কাটা-কাটি নেই বদলাবারও প্রয়োজন নেই। যে পৃষ্ঠায় অদল বদল আছে সেটাতো সাধারণ কাগজ, পুনরায় টাইপ করে নিন। শুনে জি. এম. সাহেব যেন প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করে বললেন স্যার এখন পাঁচটা বেজে গেছে এখনও আমি খাইনি। এ ছাড়া টাইপ করবে কে? টাইপিস্ট বহু আগে চলে গেছে। এফ. ডি. সাহেব

www.pathagar.com

বললেন আপনি যেমন খাননি আমরাও কেউ খাইনি। মোহাইমেন সাহেবও না খেয়ে বসে আছেন। তাকে কথা দিয়েছি আজ চেক দেব,, সে কথার নড়চড় হবে না। দু'মাস তার ফাইল ফেলে রেখেছেন আজ তার ক্ষতি-পূরণ করতে হবে। আপনার টাইপিস্ট না থাকে আমার টাইপিস্ট ধার দিচ্ছি তাকে দিয়ে টাইপ করিয়ে নিন। জি. এম. সাহেব আর কি করেন, রাগে অপমানে আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ করে ফাইল নিয়ে উঠে গিয়ে আধ ঘন্টা পরে টাইপ করে নতুন এগ্রীমেন্ট নিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। তারপর চেক লেখা হলে যখন দু'জনের দস্তখত হলো তখন প্রায় ছ'টা বাজে। দু'টায় অফিস ছুটি হওয়া সত্বেও চার ঘন্টা বসিয়ে রেখে ওয়াদা পূরণ করে চেক দিতে আমার জীবনে আমি আর কখনও দেখিনি। ছ'টার সময় এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজার টাকার চেক পকেটে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসছি তখন মনে হলো এরকম দু'চার জন অফিসার এখনও আছেন বলে দেশটা চলছে। তবে এদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে এবং ক'দিন পর আর থাকবে কিনা সন্দেহ। তারপর কি হবে সেটাই চিন্তার বিষয়। জি-এম সাহেব যে কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার ফাইল আটকে রেখেছিলেন এটা আমি মনে করি না। এটা তার সম্পূর্ণ উদাসীনতা ও গাফিলতির জন্য ঘটেছে বলে মনে হয়। তবে এটাও এক ধরনের দুর্নীতি ও নৈতিক অপরাধ যা অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সন্দিহান করে তোলে। যার ফলে আস্থা নষ্ট হয় এবং চারদিকে হতাশার সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পর থেকেই অফিসার, সরকারী কর্মচারী কারোরই ভদ্র-ভাবে জীবনধারণার্থে নিম্নতম মান বজায় রাখার জন্য আয়ের সঙ্গে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের কোন সঙ্গতি না থাকার ফলে পরিবার পরিজনের সর্বনিম্ন চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক সৎ অফিসারকে অনিচ্ছা সত্বেও উপরি আয়ের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। আর এটা এমনই মারাত্মক যে একবার এপথে পা বাড়ালে লালসার আর সীমা থাকে না। যতটুকু একান্ত প্রয়োজন শুধু ততটুকুই ঘুষ নিব এটা আর হয়ে উঠে না। তখন টাকাই তাদের কাছে খোদা হয়ে উঠে। গাড়ী, বাড়ী, অপরিমিত ধন সম্পদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আহরণের জন্য পাগল হয়ে উঠে এবং তাতে আশে পাশের সৎ মানুষগুলির জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এ অবক্ষয়ের হাত থেকে, এ আত্মহননের হাত থেকে আজ সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রায় কারোরই রেহাই নেই।

www.pathagar.com

উপরে আমি যে দু'চারজন সাধু অফিসারের কথা বলেছি তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম, নিয়ম নন। নিয়ম যারা তারা হলেন কাজেম আলী, সেকান্দার মুনির, এইচ. এম. হক প্রভৃতি। এরাই হল বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রতি-নিয়ত এরা অতি কৌশলে অর্থনৈতিক চাপে মানুষের মনের রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে, বিবেক বর্জিত-করে সকল স্তরের মানুষের আত্মাকে নিঃশব্দে হত্যা করে চলেছে। এ অবস্থা এক দিনে সৃষ্টি হয়নি, বহু দিনের পাপের ফসল এটা। এর থেকে মনে হয় আজ কারোরই পরিত্রাণ নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে এর জন্য দায়ী কে? এবং এর প্রতিকার কি? মন থেকে উত্তর আসে, এর জন্য দায়ী বর্তমান আর্থ-সমোজিক ব্যবস্থা যে অবস্থায় মানুষের ভবিষ্যতের কোন নিরাপত্তা নেই, যে নিরাপত্তা বোধের অভাবে মানুষের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা, সকল শুভ চিন্তা কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে। এ সমাজ ব্যবস্থায় একজন আর একজনের সহযোগী না হয়ে সর্বক্ষেত্রে আর এক-জনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিচ্ছে। একজনের ক্ষয়ের উপর আর একজনের জয় নির্ভর করছে। এর প্রতিকার হলো আর্থ-সামাজিক ও সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজন যার ভিত্তি হবে ন্যায় নীতি, দেশের সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করন এবং সার্বভৌম আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। এর সমাধান হলো আর্থ-সামাজিক ও সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। কিন্তু করবে কারা? এর উত্তর আমার জানা নেই। তবে যারাই করুক তাদের জন্য রইল আমার অনন্ত শুভেচ্ছা।

---

www.pathagar.com

আবদুল্ল মোহাইমেনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী পাঁচটি বই

(১) বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ (২) একটি আত্মার মৃত্যু (৩) সোভিয়েতে দুই সপ্তাহ ও অন্যান্য রচনা এবং (৪) দুই দশকের স্মৃতি (৫) ব্যবধান

সাহিত্য জগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রফেসার সৈয়দ আলী আহসান ইত্তেফাকে লিখেছেন,— মোহাইমেন সাহেব দু'বছরের মধ্যে লেখার জগতে যে চমক সৃষ্টি করেছেন, তা অনেক লেখকের জন্য ঈর্ষার বস্তু। তাঁর লেখার সাবলীলতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা মনকে গভীরভাবে আবিষ্ট করে।

সু-সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুস সুলতান সংবাদে লিখেছেন যে, মোহাইমেন সাহেব সাহিত্য জগতে নবাগত হলেও সময়ের দিক দিয়ে মোটেও ভুল করেন নি। দেশে যখন সুনীতি, সুন্দর আর সুষ্ঠ চিন্তার দুর্ভিক্ষ, জীবন যখন নৈরাজ্য আর মূল্যনাশের আঁধারে নিমজ্জিত, সেই সময় তিনি লেখনী ধারণ করছেন"। একটি আত্মার মৃত্যু তার অনবদ্য রচনা।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ আশরাফ সিদ্দীকি বিচিত্রায় লিখেছেন, মোহাইমেন সাহেব এক বছরের মধ্যে আমাদের সাহিত্য জগতে দুটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর 'একটি আত্মার মৃত্যু' একটি সুখপাঠ্য এবং একজন সমাজ দরদী ব্যক্তিত্বের অসহায় আর্তনাদ। তিনি যা দেখেছেন তা সাশ্রু নেত্রে বলেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আবদুল্লাহ ফারুক বলেন 'একটি আত্মার মৃত্যু' শুধু মোহাইমেন সাহেবের একার মৃত্যু নয়, এটি সমগ্র দেশের আত্মার মৃত্যু। সাধারণ মানুষকে ফাঁকি দিয়ে মুষ্টিমেয় লোক দেশের সমস্ত সম্পদ করায়ত্ব করছে কি ভাবে তা মোহাইমেন সাহেব নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত সাহসিকতা এবং দক্ষতার সাথে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সুসাহিত্যিক প্রফেসার আসহাব উদ্দিন দৈনিক আজাদিতে লিখেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যা-গুলি মোহাইমেন সাহেব তাঁর লেখনীতে যে ভাবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর সমাধানের পথও নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন তজ্জন্য তার কাছে জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর 'একটি আত্মার মৃত্যু' ও অন্যান্য বইগুলি অনবদ্য রচনা।

www.pathagar.com

প্রফেসার জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বাংলাদেশ টাইমস্-এর 'একটি আত্মার মৃত্যু' সম্বন্ধে লিখেছেন, "The peculiarity of this book is once you start reading, it holds you in tight grip then you turn page after page and all on a sudden you feel sorry the book is finished", তাঁর এই মন্তব্য মোহাইমেন সাহেবের সবগুলি বই সম্পর্কে বোধ হয় প্রযোজ্য।

সাম্যবাদী দলের চেয়ারম্যান জনাব তোয়াহা মন্তব্য করেছেন 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ' ও 'একটি আত্মার মৃত্যু' অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী রচনা যা প্রত্যেক চিন্তাশীল লোককে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। এগুলির বৈশিষ্ট্য হলো পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না।

প্রাপ্তিস্থান :—পাইওনিয়ার পাবলিকেশনস্ ২নং ডি. আই. টি. এভিনিউ (এক্সটেনশন), মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে।

www.pathagar.com

জনাব আবদুল মোহাইমেন ১৯২১ সনের নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় গুলাখালী গ্রামে নানার বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর পৈত্রিক নিবাস হলো লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত নুরুল্লাপুর গ্রামে। তার পিতা ছিলেন মরহুম আবদুল মতিন বি,এ, বিটি—যিনি নোয়াখালী জেলা স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে ১৯৪৭ সনে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব আবদুল মোহাইমেন চট্টগ্রাম মুসলিম হাই-স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে আই,এ, পাশ করে কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৩ সনে বি, এ, পাশ করেন। কোলকাতা থাকার সময় মাঝে মাঝে তিনি আজাদ পত্রিকায় লিখতেন। তিনি ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি পাইওনিয়ার প্রেস নামে একটি ছোট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে দেশের মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে এই শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে মুদ্রণ শিল্পের যে অভাবিত অগ্রগতি হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৫৪ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি পাকিস্তান প্রিন্টিং এসোসিয়েসনের পূর্বাঞ্চল শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং দুই বৎসর নিখিল পাকিস্তান সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬২ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের অনারারি জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪৯ সন থেকে তিনি দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সভার সভ্য হন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর কতগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যেগুলি সুধী সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বুলবুল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বহু বৎসর যাবৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবেও তিনি একজন পরিচিত ব্যক্তি।

বাংলাদেশ যৌতুক বিরোধী সমিতির তিনি প্রেসিডেন্ট এবং এই সমিতির নিরলস চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যৌতুক বিরোধী আইন পাশ হয়। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৮৪ সনে "বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামীলীগ" নামে তাঁর একটি বই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চমকের সৃষ্টি করে এবং বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ সমাদৃত হয়। "একটি আত্মার মৃত্যু" বইটির পাণ্ডুলিপি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের ধারণা—এই বইটিও পাঠক মহলে দারুন সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে। জনাব মোহাইমেনের লেখার বৈশিষ্ট হলো তার ভাষা অতি সহজ সরল এবং বেগবান।